POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(সূরা আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 5

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 Feb, 2024 20 রজব 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমান- এ ১২৮তম সালানা জলসা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল।

এই যুগ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, কুরআন করীম এবং হযরত আকদস মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

সমস্ত দেশে জলসাসমূহের আয়োজন, সসম্মানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা,তাঁর নামে জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা- এগুলি সবই সেই ঐশী প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণ যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং আঁ হযরত (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর দাসত্বে আগমণ করেছেন।

কাদিয়ান জনপদটি একশ' বছর পূর্বে এক অখ্যাত গ্রাম ছিল যা আজ এক সুন্দর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই খ্যাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নামের কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির কারণে। আজ এই জনপদে পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সৈয়্যদ তানভীর আহমদ সাহেব, সদর মজলিস ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান। মাননীয় তারিক আহমদ লোন সাহেব (কাশ্মীর) সূরা আল হুজরাতের ১২-১৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় নুরুদ্দীন নাসির সাহেব,সদর আমুমী লোকাল আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা।

মাননীয় তানভীর আহমদ সাহেব খাদিম, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ পাঞ্জাবী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি'।

দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশনটি সর্বধর্ম সম্মেলন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের ধর্মপ্রধান, সাধু-সন্ত ও পণ্ডিত এবং চার্চের পাদ্রীদের আমন্ত্রিত করা হয়। এছাড়াও রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকেন যারা জলসা এবং জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা সম্পর্কে শুভ চিন্তাধারা ব্যক্ত করে থাকেন। মাননীয় তানভীর আহমদ খাদিম সাহেব একে একে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আবেদন করেন। অতিথিদের নাম নিম্নরূপ-

অবিনাশ খান্না সাহেব, প্রাক্তন বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা, কুলদীপ সিং ধালিওয়াল সাহেব, এন.আর.আই মন্ত্রী, পাঞ্জাব সরকার,জগরূপ সিং শিখুওয়াঁ সাহেব, আঞ্চলিক ইনচার্জ আম আদমি পার্টি, জেলা গুরদাসপুর। মাননীয় সামন্ত রায় সাহেব, ফাদার বিশপ নর্থ ইন্ডিয়া (অমৃতসর), ফতেহ জঙ্গ সিং সাহেব বাজওয়া, এম.এল.এ (কাদিয়ান), রমন বহল সাহেব (খুশহাল বহল সাহেবের পুত্র), চেয়ারম্যান পাঞ্জাব হেল্‌থ সিস্টেম কর্পোরেশন, সন্ত বাবা সুখদেব সিং বেদী (গুরুনানক দেব এর ১৬তম প্রজন্ম), মাননীয় আমন শের সিং সাহেব শিরী কিলসী, এম.এল.এ (আম আদমি পার্টি, বাটালা), মাননীয় ডক্টর রাজকুমার সাহেব এম.এল.এ (ছব্বেওয়াল, হোশিয়ারপুর) (বিরোধী দলনেতা(উপ), পাঞ্জাব বিধানসভা), মাননীয় প্রতাপ সিং বাজওয়া এম.এল.এ কাদিয়ান (বিরোধী দলনেতা, পাঞ্জাব বিধানসভা), মাননীয়া অনুরাগ সুদ, হোশিয়ারপুর, পদ্মশ্রী মননীয় বিজয় কুমার চোপড়া সাহেব, সি.এম.ডি হিন্দ সমাচার গ্রুপ,জলন্ধর।

প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশন

জলসা সালানা কাদিয়ান ২০২৩ এর প্রথম দিনের প্রথম দ্বিতীয় অধিবেশন ঠিক সোওয়া দুটোর সময় শুরু হয়। মাননীয় রফিক আহমদ সাহেব মালাবারি, উকিলে আলা তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান-এর সভাপতিত্বে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। তিলাওয়াত করেন মাননীয় হাফিজ উমায়ের আব্বাস নায়েক সাহেব,মুরুব্বী সিলসিলা। তিনি সূরা আনফাল -এর ২০-২৫ নং আয়াতের তিলাওয়াত করেন। উক্ত আয়াতসমূহের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় ডক্টর জাভেদ আহমদ লোন সাহেব, নাযির দিওয়ান কাদিয়ান। মাননীয় সৈয়্যদ আহমদ সাহেব মালকানা, মুরুব্বী সিলসিলা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাননীয় মৌলনা জয়নুদ্দীন হামীদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'সাহাবাগণের জীবনী- হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)।

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৌলনা মুনীর আহমদ খাদিম,এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, জুনুবী হিন্দ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর খুতবা ও ভাষণসমূহের কল্যাণ ও গুরুত্ব।'

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা মুযাম্মেলের ১৬নং আয়াতের তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন এই আয়াতটি অনুবাদ হল-

নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসুল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসুল। (সূরা মুযাম্মেল. আয়াত: ১৬)

তিনি বলেন, আজ কাদিয়ানে জামাত আহমদীয়া ভারতের জলসা সালানার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। বেশ কিছু অন্য দেশও আছে যেখানে সম্প্রতি কিম্বা

এরপর শেষ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

এই যুদ্ধে মুসলমানেরা ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আর আব্দুল্লাহ বিন জু বায়ের (রা.)'র সেনাদের ভুলের কারণে এই বিপদ নেমে আসে। পক্ষান্তরে অনেক বড়ো একটি লাভও হয়েছে আর তা হলো, মুনাফিকদের কপটতা এবং ইহুদীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে আর নিষ্ঠাবান মুসলমান (মুনাফিক হতে সুস্পষ্টভাবে) পৃথক হয়ে গেছে। "

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে সে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে।

তারা জগতের বাসনা করছিলো আর অন্যরা পরকালের আকাঙ্ক্ষা করছিল মর্মে বিতর্কই অযথা। কেননা বাস্তবে সেই 'দুনিয়া' ছিলই বা কতটুকু? এটি খুবই অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়।

সাহাবীদের প্রতি জাগতিকতার (অপবাদ) আরোপ করা সঠিক নয়।

সেদিন থেকে পূর্ববর্তী সকল জাতির মাঝে লাশের অমর্যাদা এবং মুসলাহ বা অঙ্গচ্ছেদের যে জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল– মুসলমানদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেবল ইসলাম ধর্মই এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আর আব্দুল্লাহ বিন জু বায়ের (রা.)'র সেনাদের ভুলের কারণে এই বিপদ নেমে আসে। পক্ষান্তরে অনেক বড়ো একটি লাভও হয়েছে আর তা হলো, মুনাফিকদের কপটতা এবং ইহুদীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে আর নিষ্ঠাবান মুসলমান (মুনাফিক হতে সুস্পষ্টভাবে) পৃথক হয়ে গেছে। "

এটি খোদার নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি অস্ত্র ধারণ করার পর তা আবার খুলে রাখবেন, (তবে,) খোদা কোনো সিদ্ধান্ত দিলে সেটি ভিন্ন কথা'। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে চলো, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

খোদার নবী বর্ম পরিধান করার পর তা আর খুলেন না। এখন যাই হোক না কেন আমরা সম্মুখেই অগ্রসর হবো। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে তোমরা খোদার সাহায্য লাভ করবে।

আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য নিব না।

মু'মিন সকল মু'মিনের মাঝে এমন যেমন টি দেহের সাথে মাথা থাকে। মাথায় ব্যাথা হলে সারা দেহ এর ফলে ব্যাথা অনুভব করে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ ডিসেম্বর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২২ফাতাহ, ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজকাল খুতবাতে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুসলমানরা গণযুদ্ধে কাফেরদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে। তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশনা সত্ত্বেও গিরিপথের সুরক্ষায় নিয়োজিত অধিকাংশ লোক যখন গিরিপথ ছেড়ে দেয় তখন শত্রুরা সেদিক দিয়ে আক্রমণ করে আর মুসলমানদের চরম ক্ষতিসাধন করে। এর বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, মুশরিকদের পতাকাবাহকরা যখন একে একে নিহত হয় এবং অন্য কেউ পতাকা উঠানো কিংবা এর কাছে আসার সাহস দেখাতে পারে নি তখন হঠাৎ মুশরিকরা পিছু হটতে আরম্ভ করে আর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তাদের নারীরাও, যারা কিছুক্ষণ পূর্বেও পুলকিত কণ্ঠে ও পূর্ণ উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সাথে ঢাক বাজিয়ে গান গাইছিল, তারা ঢাক ফেলে বাহিরের দিকেছোটে। মুসলমানরা শত্রুদের পালাতে দেখে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং গনিমতের সম্পদ একত্রিত করতে থাকে। তখনই মুসলামানদের সেই তিরন্দাজ দল, যেটিকে মহানবী (সা.) পাহাড়ের ওপর মোতায়েন করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই নিজ স্থান পরিত্যাগ না করে, সেখান থেকে গনিমতের সম্পদ একত্রিত করার জন্য ছোটে– এটি বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই দলের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের তাদেরকে কঠোরভাবে বারণ করেন যে, তাদের কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা মানে নি এবং বলে, মুশরিকরা পরাজয় বরণ করেছে। এখন আমরা এখানে থেকে কী করব? একথা বলে তারা পাহাড় থেকে নেমে আসে আর গনিমতের সম্পদ একত্রিত করতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ নিজ স্থান পরিত্যাগ করলেও তাদের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এবং আরও কতিপয় সাহাবী নিজ স্থানে অনড় থাকেন যাদের সংখ্যা দশজনেরও কম হবে। তিনি গিরিপথ থেকে নীচে অবতরণকারীদের বলেন, আমি কিছুতেই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করব না।

অর্থাৎ তাদের দলনেতা এই কথা বলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকার গিরিপথ পরিত্যাগকারী সাহাবীদের উল্লেখ করতে গিয়ে এটিই বর্ণনা করেন যে, তাদের গনিমতের সম্পদ হস্তগত করার তাড়া ছিল। তাই তারা জোর দিচ্ছিল যে, বাকি সবাই যখন গনিমতের সম্পদ জমা করছে তখন আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? অথচ তাদের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের তাদেরকে নিষেধ করে বলেন, আমাদেরকে মহানবী (সা.) এই নির্দেশই দিয়েছিলেন যে, যা-ই হোক না কেন– তোমরা নিজেদের এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। তাই আমাদের এখানেই অবস্থ ান করা উচিত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আমীর বা দলনেতার কথায় একমত হয় নি আর গনিমতের সম্পদ জমা করার জন্য গিরিপথ থেকে নীচে নেমে আসেন– অধিকাংশ ঐতিহাসিক এটিই লিখেছেন। আর হাদীস এবং তফসীর গ্রন্থাবলিতেও সাধারণত এই বর্ণনাই পাওয়া যায় যে, এই সাহাবীরা গনিমতের সম্পদ লাভের তাড়ার কারণে গিরিপথ পরিত্যাগ করে চলে যান। আর সূরা আলে ইমরান-এর ১৫৩ নাম্বার আয়াতে যে বর্ণিত হয়েছে, مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে এমনও আছে যারা জগতের বাসনা রাখত। আর তোমাদের মাঝে এমনও ছিল যারা পরকাল পাওয়ার বাসনা রাখত– এর তফসীর বা ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তফসীরকারীও এটিই লিখেছেন যে, সাহাবীরা গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য দ্রুত যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবীদের সম্পর্কে এই জাগতিক বাসনার জন্য গিরিপথ পরিত্যাগের কথা গ্রহণ করা যায় না।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও একটি অপ্র কাশিত ব্যাখ্যামূলক নোট লিখেছিলেন যা ছাপা হয় নি। সেটি আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব, এর ব্যাখ্যায়। তার পূর্বে কিছু কথা বর্ণনা করছি। প্রথমে পুরো আয়াতটি বর্ণনা করছি। পুরো আয়াতটি হলো-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (آل عمران:153)

(সূরা আলে-ইমরান: ১৫৩) আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন। যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে তাদের মূলোৎপাটন করছিলে। যতক্ষণ না তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করলে আর তোমরা প্রকৃত নির্দেশ সম্পর্কে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করছিলে। আর তোমরা যা পছন্দ করতে তিনি তোমাদের সেসব পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তোমরা অমান্য করলে। তোমাদের মাঝে এমন লোকও ছিল যারা জগতের বাসনা রাখত। আর তোমাদের মাঝে এমনও ছিল যারা পরকালের বাসনা রাখত। এরপর তিনি তোমাদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর যা-ই হয়েছে, তিনি নিশ্চিতরূপে তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন)। আর আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের প্রতি অনেক অনুগ্রহশীল।

এটি হলো সেই আয়াত যার তফসীর বা ব্যাখ্যায় এই ধারণা করা হয় যে, গনিমতের সম্পদের জন্য তারা স্থান ছেড়েছেন অথবা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবীদের সম্পর্কে একথা বলা যে, তারা মালে গনিমতের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন এমন কথা চিন্তা করাও তাদের মর্যাদার পরিপন্থি। তারা তো স্বীয় স্ত্রী, সন্তান, এমনকি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে প্রিয় খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর চরণে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। এর পূর্বে তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও মালামালও এই পথেই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। শাহাদাতের বাসনায়, যেমনটি পূর্বে ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, তারা বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এসব যুদ্ধ গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য করা হচ্ছিল না, এটিতো মুসলমানদের ওপর অপবাদ। হ্যাঁ, বিজয়ের ক্ষেত্রে গনিমতের সম্পদ লাভ করা একটি বর্ধিত বিষয় হতে পারে, কিন্তু গনিমতের সম্পদ অর্জন করা সাহাবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেই হতে পারত না।

যাইহোক, ইসলামের ইতিহাসে ও মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, জীবনীকার অথবা হাদীস বর্ণনাকারী কিংবা তফসীরকারী বুযুর্গ গণের মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে। কেবল কোনো রেওয়ায়েতের সনদ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তারা নিজেদের সরলতায় অথবা এ ভেবে যে, এই রেওয়ায়েত সঠিক হবে- এমন কথা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীরা গনিমতের সম্পদের জন্য নীচে নেমে এসেছিলেন! তারা এই বিষয়টি অনুধাবন করেন নি যে, পরিণতি ও প্রভাবের নিরিখে এই বিষয়টি কত বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আর সেই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণমণ্ডিত সত্তা হোক অথবা তাঁর পবিত্রকরণ শক্তিতে কল্যাণলাভকারী সাহাবীগণ (রা.) হোক, কতটা তাদের মর্যাদাবিরোধী হতে পারে! যাহোক, সাহাবীদের আত্মত্যাগ এবং শাহাদাতের প্রেরণা দৃষ্টে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, সাহাবীরা কেবল গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য সেই গিরিপথ ছেড়ে আসতে তাড়াহুড়া করেছিলেন। খুব সম্ভব, এই সাহাবীরা যখন দেখেন যে, মুসলমানরা এখন বিজয়ীর আসনে আর তারা শত্রুদের তাড়াচ্ছে এবং তাদের পিছু ধাওয়া করছে, তখন গিরিপথে উপস্থিত সাহাবীরা এই স্পষ্ট বিজয়ের আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।আর বিজয়ে পর্যবসিত হওয়া এই যুদ্ধের শেষ ক্ষণে যোগ দেয়ার বাসনায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন যে, আমরাও এই আনন্দে অংশীদার হতে চাই। তারা হয়ত ভাবছিলেন যে, আমাদের অন্য ভাইয়েরা তো জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে আর আমরা এখানে গিরিপথে দাঁড়িয়ে আছি। তাই জিহাদে অংশ নেওয়ার বাসনায় তারা ছিলেন উদ্বেলিত যে, এখন বিজয় তো হয়ে গেছে। অতএব আজকের দিনে যে জিহাদের যবনিকাপাত ঘটতে যাচ্ছে কার্যত তাতে কিছুটা হলেও অংশগ্রহণ করি। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে এই বিজয়ের আনন্দ তো উদযাপন করে নিই। কিন্তু তাদের দলনেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের, যিনি অধিক বিচক্ষণ প্রমাণিত হন, তার দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশের প্রতি ছিল যে, যা-ই হোক না কেন- এখান থেকে নড়বে না। এটি ছিল তার সিদ্ধান্ত আর এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল যে, যাই হোক আমাদের এখান থেকে সরা উচিত হবে না।

যেমনটি আমি বলেছিলাম, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র অপ্রকাশিত নোটে এই আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর সাথে তিনি লিখেছেন যে, مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا এখানে দুনিয়া বলতে গনিমতের সম্পদ নয়, বরং জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় বুঝায় আর আখিরাতের অর্থ হলো ফলাফল এবং শেষ পরিণতি। একথা মনে করা যে, তারা ভাবছিলেন আমরা গনিমতের সম্পদ পাব না- এটি বাস্তবতা পরিপন্থি। কেননা বদরের যুদ্ধের সময় তো তারাও গনিমতের সম্পদে অংশ লাভ করেছিল যারা কিছু অপারগতার কারণে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে নি। তাই এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। সাহাবীদের প্রতি জাগতিকতার (অপবাদ) আরোপ করা সঠিক নয়।

একথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন। প্রকৃত কথা হলো, তাদের এই বাসনা ছিল যে, আমরাও এই উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। এটিও জাগতিক ধারণা ছিল যে, আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং কাফেরদের হত্যা করব। মালে গনিমত একত্রিত করার কথা এখানে বলা হয় নি। তোমাদের এই ধারণা ছিল যে, আমরা কোথাও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের থেকে পিছিয়ে না থাকি! কিন্তু এটিও এক জাগতিক ধারণা। জাগতিক ভাবনা বলার কারণ হলো, কেননা কেবল যুদ্ধ করা তো কোনো বড় বিষয় নয়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন না করা- এটি জাগতিকতা বৈকি। তোমাদের তো নির্দেশ পালন করা উচিত ছিল আর তা-ই যথেষ্ট। কেননা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন না করা- তা ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ হলেও এবং যেটি থেকে তিনি (সা.) বারণ করে অন্য কোথাও দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তাই সেই নির্দেশ পালন করা হলো মূল ধর্ম, যুদ্ধ করা নয়। অতঃপর তিনি বলেন, وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ এখানে (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, তোমাদের দলনেতা ও তার সঙ্গীরা তো পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিল। তাদের দৃষ্টিপটে ছিল শেষ পরিণতি ও ফলাফল। তারা মনে করতেন , এর ফলাফল ভালো হবে না। তিনি নির্দেশ অমান্য করার অশুভ ফলাফল দেখতে পাচ্ছিলেন। একইভাবে তার সঙ্গীরাও তার মত সঠিক বলে মনে করছিলেন। দলনেতা ও তার সাথে সহমত পোষণকারী সঙ্গীদের দৃষ্টি এই বিষয়টির শেষ ফলাফলের প্রতি ছিল যে, তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। (এখানে) বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এর বিপরীতে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাহ্যিকতার ওপর। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই অর্থ সাহাবীদের সেই মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে যা তাদের কাজ এবং তাদের কুরবানী থেকে প্রকাশ পায়। "

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর অপ্রকাশিত নোটস, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৩]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র উক্ত নোটের উল্লেখ করে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তারা জাগতিক কামনাবাসনা রাখত অর্থাৎ তার সাথে মতভেদকারীদের কথা বলা হচ্ছে। অপরদিকে দলের নেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের পরজগৎ চাইতেন। খলীফা রাবে (রাহে.) বলেন, এই বিষয়টিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজ নোটে বর্ণনা করেছেন আর বেশ ভালো একটি দিক তুলে ধরেছেন যে, এখানে মানুষের লুটপাট ও গনিমতের সম্পদ একত্রিত করার অর্থ করা সঠিক নয়। তাদের দৃষ্টি সাময়িক বিজয়ের প্রতি ছিল। আর এখানে দুনিয়া বলতে যা বু ঝায় তা হলো, যে বিষয়টি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে তাদের দৃষ্টি সেটির প্রতি ছিল, অর্থাৎ যুদ্ধে যে বিজয় লাভ হয়েছিল (সেটির প্রতি)। আর আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র দৃষ্টি ছিল পরকালের প্রতি। তিনি হযরত রসূলে আকরাম (সা.)-এর সন্তুষ্টিতে সবচেয়ে বড় সফলতা নিহিত বলে মনে করতেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আল্লাহ্ তা'লা যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে সাময়িকভাবে যেসব জিনিস দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তুচ্ছ এছিল তাদের পরম চাওয়া। আমাদের প্রকৃত পুণ্য হলো তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খলীফা রাবে (রাহে.) এরপর বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা জগতের বাসনা করছিলো আর অন্যরা পরকালের আকাঙ্ক্ষা করছিল মর্মে বিতর্কই অযথা। কেননা বাস্তবে সেই 'দুনিয়া' ছিলই বা কতটুকু? এটি খুবই অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়। এরপর তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, যারা গিরিপথের সুরক্ষায় মোতায়েন ছিল তারা যখন গিরিপথ ছেড়ে দিয়েছে তখন পর্যন্ত তোসবকিছু ভাগবাটোয়ারাও হয়ে গিয়ে থাকবে। আর (বাকি রইল) এই ধারণা যে, তাদেরসেখানে গিয়ে তাতে যোগ দেয়ার তাড়া ছিল! এরা কেন চিন্তা করে না, যেমনটি পবিত্র কুরআন বলে যে, নিজেদের লোকদের প্র তি সুধারণা পোষণ করো যে, তারা হয়ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গিয়েছিল যে, সবাই বিজয় উদযাপন করছে, আনন্দ করছে, মহানবী (সা.)-এর নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পরকে মোবারকবাদ দিচ্ছে; তাহলে আমরা কেন এই আনন্দ উল্লাস থেকে পেছনে থাকব? অনেক সময় এমনটি হয়ে থাকে আর এটি একেবারে (মানুষের) প্র কৃতি-সম্মত। অর্থাৎ, যেখানে উৎসব পালন করা হয়, আনন্দ উদযাপন করা হয়- সবাই সেখানে ছুটে যায়। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, এখানেও (লন্ডনে) বসবাসের সময় অনেক বার দেখেছি যে, কোনো ভালো সংবাদ এলে লোকজন সমবেত হয় আর আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য আসে। এখানে তো তারা কোনো মালে গনিমত নেওয়ার জন্য আসে না। তাই তারা হয়ত ভাবলেন যে, নীচে এতটা আনন্দ উদযাপন হচ্ছে, যেখানে মহানবী (সা.) ছিলেন। সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে (অথচ) আমরা এখানে একাকী দাঁড়িয়ে আছি; (তাই) আমরাও সেখানে যাই। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র দৃষ্টি ছিল আখিরাতের ওপর।

অর্থাৎ এ সময়ের আনন্দের চেয়ে এটি অনেক বেশি আনন্দের বিষয় হবে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর খাতিরে একদিকে পৃথক বসে থাকি। আমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তা পালন করি। আর এর যে আনন্দ তা মূলত সেই আনন্দ নয় যা সেখানকার খুশিতে রয়েছে।

(দরসুল কুরআন, ৫ই রমযান, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪)

যাইহোক, একদিকে যখন কাফের সৈন্যরা চরমভাবে পরাস্ত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছিল অপরদিকে পাহাড়ের গিরিপথে মোতায়েন পঞ্চাশজনের মধ্য হতে প্রায় চল্লিশজন মুজাহিদ গিরিপথ (অরক্ষিত) রেখে নীচে নেমে আসে তখনই খালিদ বিন ওয়ালীদ (তিনিতখনও ঈমান আনেন নি) দেখেন যে, সেই পাহাড়ি গিরিপথ যেখানে তিরন্দাজদের দল মোতায়েন ছিল খালি হয়ে গেছে, মাত্র কয়েকজন পাহারাদার অবশিষ্ট আছে। এটি দেখামাত্রই সে ইকরামা বিন আবু জাহলকে সাথে নিয়ে নিজের অশ্বারোহী দলসহ ফিরে আসে। তারা পাহাড়ে চড়ে তিরন্দাজ দল থেকে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেই গুটিকতক লোকের ওপর হামলা করে। তাদের এই আক্রমণ এতটাই জোরালো ছিল যে, একই আক্রমণে তারা এই দলের নেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জু বায়ের (রা.) এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে হত্যা করে। তারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র লাশের অঙ্গাচ্ছেদ করে; অর্থাৎ হাত-পা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলে। এরপর কুরাইশের এই দলটি নীচে নেমে অতর্কিতে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে।

মুসলমানরা তখন অসতর্কাবস্থায় গনিমতের মাল একত্র করা এবং মুশরিকদের বন্দি করার কাজে ব্যস্ত ছিল। এরই মধ্যে আচমকা মুশরিকদের অশ্বারোহী দল ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। (তখন) এরা উয্যা এবং হুবল এর জয়ধ্বনি দিচ্ছিল, যা উহুদের দিন মুশরিকদের নারাধ্বনি ছিল। তারা মুসলমানদের অসতর্ক অবস্থায় তাদের ওপর তরবারির আঘাত হানে। মুসলমানরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে। মালে গনিমত হিসেবে তারা যা কিছু একত্র করেছিল এবং যতজনকে বন্দি বানিয়েছিল তাদেরকে ফেলে মুসলমানরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। না তাদের সারি ঠিক থাকে আর না শৃঙ্খলা বাকি থাকে। তারা একে অন্যের সম্পর্কে ছিল উদাসীন। মুশরিকদের পতাকা তখনও মাটিতেই পড়ে ছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থা দেখে হঠাৎ একজন মহিলা আমরা বিনতে আলকামা সেটি তুলে উচ্চকিত করে আর মুশরিকদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ফিরে আসার জন্য ডাকতে আরম্ভ করে। পলায়নরত মুশরিকরা নিজেদের পতাকা উড্ডীন দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে যে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে এবং সবাই ফিরে এসে নিজেদের পতাকার চতুর্দিকে সমবেত হয়।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, প: ৩০৮)

একজন লেখক লিখেছেন, আমরা বিনতে আলকামা নামের একজন মহিলা রক্ত ও ধূলিমলিন কুরাইশের পতাকাটি তুলে ধরে। (আর) সে জোরে জোরে সেটি ওড়াতে থাকে এবং (যুদ্ধ) ক্ষেত্র হতে পলায়নকারীদের তিরস্কার করতে থাকে। সে মক্কার কাফেরদেরকে ফিরে আসার জন্য ডাকছিল। এভাবে পরাজিত কাফেররা উহুদ-প্রান্ত রে পুনরায় সমবেত হয় আর তারা সামনে ও পেছনদিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা নিজেদের আশংকামুক্ত মনে করে সারি ভেঙ্গে ফেলেছিল তাই তাদের (মাঝে) তখন কোনো শৃঙ্খলা বা বিন্যাস ছিল না।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৮৬]

সেদিন মুসলমানরা বেশ বড় সংখ্যায় শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে। পূর্বের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। একজন লেখক সে সময়ের চিত্র অংকন করতে গিয়ে লিখেছেন, তিরন্দাজদের ভুলের পর মুসলমানরা নিজেদের শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তারা গনিমতের মাল নিজেদের হাত থেকে ফেলে দেয় এবং দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে আর তাদের মধ্য থেকে অনেকেই দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। তারা জানতো না যে, তারা কোথায় যাবে; বিশেষ করে মুশরিকদের ঘোষকের (এই) ঘোষণার পর যে, মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এটি এক চরম পরীক্ষা ছিল যাতে অনেক মুসলমান নিজেদের ভাইদের হাতে অজান্তে শহীদ হয়ে ভূপাতিত হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভুলবশত মুসলমানদেরও হত্যা করে। আর আশংকা ছিল যে, শত্রুদের বিশাল সংখ্যা যারা খালিদ বিন ওয়ালীদের পাল্টা আক্রমণের পর পুনরায় নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল করে নিয়েছিল, তারা স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের ধ্বংস করে দিবে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। (গাযওয়ায়ে ওহদ, প্রণেতা-মহম্মদ আহমদ বাশমিল, পৃ: ১৪০-১৪১)

কিন্তু যাইহোক, এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন তাই শত্রুরা যা চাচ্ছিল তা হয় নি। হযরত হুযায়ফা (রা.)'র পিতা ইয়ামান এর ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সাহাবীদের পরস্পরকে হত্যা করার একটি উদাহরণ হলো, হযরত হুযায়ফা (রা.)'র পিতা ইয়ামান এর, যাকে মুসলমানরা অজান্তে শহীদ করেছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য যান তখন সাবেত বিন ওয়াখশ এবং হুসায়েল বিন জাবের, যার নাম ছিল ইয়ামান আর তিনি হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতা ছিলেন, উভয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন; তারা সেই দুর্গে ছিলেন যাতে মুসলমানদের নারী ও শিশুরা নিরাপত্তার জন্য আশ্রিত ছিল। তাদের (বৃদ্ধদের) মধ্য হতে একজন অপরজনকে বলেন, তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? অর্থাৎ তারা উভয়েই দুর্গে আবদ্ধ অবস্থায় বসে ছিলেন। কথাবার্তা বলছিলেন যে, আমরা কিসের অপেক্ষা করছি? আমাদের জীবনে দিনতো আর বেশিবাকি নেই, আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আজ নয়তো কাল আমরা মরবই। আমরা নিজেদের তরবারি (হাতে) তুলে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হলে কেমন হয়? হয়ত আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লিখে দিবেন। এরপর তারা উভয়ে তরবারি নিয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লোকজনের সাথে মিশে যায়। অর্থাৎ, মুসলমানরা তো জানত যে, এই উভয় প্রবীণ যুদ্ধে যোগদানই করেন নি বরং মদীনায় অবস্থান করছেন। অথচ তারা রণক্ষেত্রে পৌঁছে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে তৎক্ষণাৎ শনাক্ত করতে বা চিনতে পারেন নি। জানাই যায় নি যে, এরা কারা? সাবেত বিন ওয়াখশকে কাফেররা শহীদ করে আর হুযায়ফার পিতাকে মুসলমানরা অজান্তে শহীদ করেন। শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হুযায়ফা তাকে দেখে বলেন, আল্লাহ্র কসম! ইনি তো আমার পিতা! মুসলমানরা বলে, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে চিনতে পারি নি, ভুলক্রমে শহীদ হয়ে গেছেন! আর বাস্তবেই তারা সত্য বলেছিলেন। হুযায়ফা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, কেননা তিনি 'আরহামুর রাহেমীন' বা সর্বোত্তম দয়ালু। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে হুযায়ফা (রা.)-কে তার পিতার রক্তপণ দিতে চেয়েছেন। ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন তাই মহানবী (সা.) বলেন, তার রক্তপণ পরিশোধ করা হোক। কিন্তু হুযায়ফা (রা.) নেন নি; তিনি নিতে অস্বীকার করেন এবং মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দেন। এতে খোদা ও মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে হুযায়ফা (রা.)'র মর্যাদা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়।

(সীরাতুননবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৭-৫৩৮)

এই যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)ও শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁর ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উমায়ের বিন ইসহাকের বরাতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দুটি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আসাদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র সিংহ। এটি বলতে বলতে কখনো সামনে যেতেন আবার কখনো পিছনে আসতেন। তিনি সে অবস্থায় হঠাৎ পিছলে পড়ে যান। ওয়াহশী আসওয়াদ তাকে দেখতে পান। আবু উসামা বলেন, সে তার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তাঁকে হত্যা করে। (আত্তাবাকাতু কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮)

এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) যা লিখেছেন তা হলো, হযরত হামযা (রা.) মহানবী (সা.)-এর আপন চাচা আর দুধভাই ছিলেন। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং যে-দিকেই তিনি যেতেন কুরাইশদের সারি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, কিন্তু শত্রুরাও তাঁর জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। জুবায়ের বিন মুতয়িম, ওয়াহশী নামক নিজের এক হাবশী দাসকে মুক্ত করে দেবার শর্তে বিশেষভাবে এই বলে সাথে নিয়ে এসেছিল যে, যেভাবেই হোক হামযাকে হত্যা করে প্র তিশোধ নিতে হবে, কেননা তিনি জুবায়ের-এর চাচা তুআইমা বিন আদী-কে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর ওয়াহশী একস্থানে লুকিয়ে তার জন্য ওৎ পেতে ছিল এবং হামযা যখন কোনো ব্যক্তিকে হামলা করে সে স্থান অতিক্রম করেন, সে তাক করে তঁ ার নাভির নীচে তার ছোট বর্শা নিক্ষেপ করে যা লাগতেই শরীরে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। হামযা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান, তবুও সাহস করে উঠে দাঁড়ান এবং ওয়াহশীর দিকে একপা বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান ও মৃত্যু বরণ করেন। আর এভাবে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একটি সুদৃঢ় হাত অকেজো হয়ে যায়।

মহানবী (সা.) যখন হামযার মৃত্যুর সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) ভীষণ মর্মাহত হন।রেওয়ায়েতে রয়েছে, তায়েফের যুদ্ধের পর যখন হামযার হন্তারক মহানবী (সা.)-এর সামনে আসে তখন তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু হামযার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনার্থে বলেন, ওয়াহশী যেন আমার সামনে না আসে।

তখন ওয়াহশী এই শপথ করে, আমি যে হাত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর চাচাকে হত্যা করেছি, সেই হাত দিয়ে যতক্ষণ না ইসলামের কোনো বড় শত্রুকে হত্যা করব ততক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না। যেহেতু মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল, চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আসে। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে সে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৪৯২-৪৯৩)

হযরত হামযা (রা.)'র লাশের অসম্মানও করা হয়েছে। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা উহুদের যুদ্ধের দিনে সৈন্যদের সাথে আসে। সে তার পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, যে কিনা বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)'র সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল- এই মানত করেছিল যে, আমি সুযোগ পেলে হামযার কলিজা চিবিয়ে খাব। এমন অবস্থার যখন উদ্ভব হয় এবং হযরত হামযার ওপর বিপদ নেমে আসে তখন মুশরিকরা হত্যাকৃত ব্যক্তিদের অঙ্গাচ্ছেদ করল, তাদের মুখাবয়ব বিকৃত করল; নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গ কেটে দিল। সে হামযার কলিজার এক টুকরা নিয়ে আসে, হিন্দা সেটিকে খাওয়ার জন্য

চিবাতে থাকে। কিন্তু যখন সে সেটিকে গিলতে পারল না তখন তা ফেলে দেয়। এই সংবাদ যখন মহানবী (সা.) পান তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আগুনের জন্য সর্বদা হামযার মাংস ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮)

মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশের কাছে এসে যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং তার উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করেন সে সম্বন্ধে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় হযরত হামযা (রা.)'র লাশ দেখেন যখন তার কলিজা চিবানো হয়েছিল। ইবনে হিশাম বলেন, এ অবস্থায় মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশের সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন, হে হামযা! তোমার কারণে আমি যে কষ্ট পেয়েছি তেমন কোনো কষ্ট আমি জীবনেও পাই নি। আমি এর চেয়ে কষ্টকর কোনো দৃশ্য অদ্যাবধি দেখি নি। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, জিবরাঈল এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব-কে সাত আকাশে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সিংহ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে একজন হিন্দাও ছিল। সে এতটাই ঘোর বিরোধী ছিল যে, উহুদের যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে এই বলে মানুষকে উসকে দিত যে, যাও! ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করো। মুসলমানরা যখন একটি ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সে বলে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)'র কলিজা বের করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, অনুরূপভাবে তার নাক, কান কেটে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব। অতঃপর হযরত হামযা (রা.)'র পবিত্র লাশের সাথে তদ্রুপ ব্যবহারই করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচার এমন অবমাননার কথা জানতে পারেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি (সা.) খুব মর্মাহত হন আর তিনি (সা.) বলেন, শত্রুরা যেহেতু এ ধরনের নির্মম ব্যবহারের সূচনা করেছে তাই আমিও তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করব। তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয় যে, তাদের এই নির্মম ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর (সা.) এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন নয় এবং ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫৩-৩৫৪)

মোটকথা ইসলামে (মরদেহ বিকৃত করা) বারণ করা হয়েছে।

এখানে হযরত হামযা (রা.)'র বোনের ঘটনাও এমর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তিনি ধৈর্য ও আনুগত্যে ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উহুদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে একজন মহিলাকে ক্ষিপ্রগতিতে আসতে দেখা যায়। তার শহীদদের মরদেহ দেখে ফেলার উপক্রম হয়। কোনো মহিলা সেখানে আসবে আরমারাত্মকভাবে বিকৃত লাশগুলো দেখবে- এটি মহানবী (সা.) পছন্দ করেন নি। তাই তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে বাধা দাও, এই মহিলাকে বাধা দাও! হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলামে এ যে, আমার মা হযরত সাফিয়া (রা.)। এরপর আমি তার কাছে ছুটে গেলাম আর শাহাদাত বরণকারীদের মরদেহের নিকট তার পৌঁছানোর পূর্বে ই আমি তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি আমার বুকে সজোরে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দেন। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন, দূর হও, আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। আমি বললাম, মহানবী (সা.) আপনাকে বাধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর বলেছেন, মরদেহগুলো দেখবেন না। একথা শোনামাত্রই তিনি থমকে গেলেন আর নিজের কাছে গচ্ছিত দু টি কাপড় দিয়ে বললেন, এই দু টি কাপড় আমি আমার ভাই হামযার জন্য নিয়ে এসেছি। কারণ আমি তাঁর (রা.) শাহাদাতের সংবাদে পেয়ে গিয়েছি। মোটকথা, তিনি (রা.) তাঁর ছেলের কথা শোনেন নি, তাকে এক ধাক্কায় পিছনে সরিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যখন মহানবী (সা.)-এর কথা শোনেন তৎক্ষণাৎ আনুগত্য প্রদর্শন করে থেমে যান। যেই না মহানবী (সা.)-এর নাম শুনেছেন, শত মর্মযতনা সত্ত্বেও সম্বিৎ ঠিক রাখেন এবং আনুগত্য করেন।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি যাবো না, থেমে গেলাম; কিন্তু মহানবী (সা.)-কে অনুরোধ করো যে, আমি জানি, আমার ভাই শহীদ হয়েছেন আর কাফেররা তাঁর (রা.) মরদেহ বিকৃত করেছে। আমি শুধু তাঁকে (রা.) একপলক দেখতে চাই আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কোনো প্রকার আহাজারি করব না, ধৈর্যধারণ করব। অতঃপর হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে একথা নিবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন,তাকে যেতে দাও; ঠিক আছে গিয়ে দেখুন। তিনি তার (রা.) ভাইয়ের মরদেহের পাশে গিয়ে বসে পড়লেন আর সিংহের মত বীর শহীদ ভাইকে দেখে অঝোরে চোখ থেকে অশ্রুবন্যা বইতে থাকে, কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটুকু ও করেন নি। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-ও তাঁর মরদেহ দেখতে গিয়ে মরদেহের পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর চোখ থেকেও অশ্রুধারা বইতে থাকে। বীর, ধৈর্যশীলা বোন কিছুক্ষণ পর অশ্রুমালার মাধ্যমে সাধুবাদ জানান। এরপর উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, আমি আমার ভাইয়ের জন্য দু টি চাদর নিয়ে এসেছি, (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে,) শাহাদতের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম বিধায় আমি নিয়ে এসেছি। তোমরা তাকে এই কাপড় দিয়ে (জড়িয়ে) দাফন সম্পন্ন করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন হযরত হামযা (রা.)-কে সেই কাপড় দিয়ে দুকাপড় বিশিষ্ট কাফন পরাতে যাই তখন লক্ষ্য করি, তাঁ ার পাশেই একজন (মদীনার) আনসার শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। হযরত হামযা (রা.)'র(লাশের) সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার (লাশের) সাথেও অনুরূপ আচরণই করা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-কে দুটি চাদরের কাফন পরাব আর এই আনসারীর ভাগ্যে একটি কাপড়ও জুটবে না- এটি ভেবে আমাদের লজ্জা হলো। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি কাপড় হযরত হামযা (রা.)-কে কাফন (হিসেবে) পরাব এবং অপর কাপড় সেই আনসার সাহাবী (রা.)-কে কাফন (হিসেবে) পরাব। অনুমান করার পর জানা যায়, তাদের উভয়ের মাঝে একজন অধিক দীর্ঘকায়। লটারি করে যার ভাগ্যে যে কাপড়টি এসেছে তাকে সেই (কাপড়ের) কাফনেই দাফন করি। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২, হাদীস=১৪১৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, হযরত হামযা (রা.) কাফের সৈন্যদলকে বিশৃঙ্খল দেখে সেনাদলের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়েন। এমন মনে হচ্ছিল যেন মুসলমানরা জয়যুক্ত। এমতাবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)'র সঙ্গীরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মালে গনিমতের আশায় ব্যূহ পরিত্যাগ করে নীচে চলে আসেন। শত্রুপক্ষ গিরিপথ খালি পেয়ে অশ্বারোহীদেরকে সংঘবদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। হযরত আমীর হামযা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জু বায়ের (রা.) শাহাদত বরণ করেন। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ও হযরত সিদ্দীক (রা.)-ও আহত হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা, হামযা (রা.)'র (বুক চিরে) কলিজা বের করে চিবায় এবং মুসলিম শহীদের নাক ও কান কেটে সেগুলো দিয়ে হার বানিয়ে গলায় পরিধান করে। শহীদদের লাশের প্রতি এমন অসম্মানজনক আচরণ দেখে মুসলমানরা ক্রোধে ফেটে পড়ে, এমনকি স্বয়ং মহানবী (সা.) এতটা মর্মাহত ও ক্রোধান্বিত হন যে, তিনি (সা.)-ও নির্দেশ দেন, এখন থেকে তোমরা জয় লাভ করলে কাফেরদের লাশের সাথে তেমনই আচরণই করবে (যেমনটি তারা আমাদের সেনাদের সাথে করেছে)। যেমন মহানবী (সা.) তার প্রাণপ্রিয় চাচা আমীর হামযাকে দেখে বলেন, لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ অর্থাৎ, আপনার (লাশের অসম্মানের) প্রতিশোধ হিসেবে তাদের সত্তরজনের মুসলা করব, (নাক ও কেটে দিব)। কিন্তু প্রকৃতিগত করুণা ও স্বভাবগত কোমলতা সাময়িক মানবীয় ক্রোধের ওপর প্রাধান্য লাভ করে; নিম্নোক্ত আয়াত وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ সেই প্রেরণা সঞ্চার করে। এমন অবস্থায় ও পরিস্থি তিতে {মহানবী (সা.)-এর} এরূপ ধৈর্যধারণ! সুবহানাল্লাহ্! وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ প্রকৃ তই সত্য (প্রমাণিত হয়েছে)। এখানে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর রাহমাতুল্লিল আলামীন হবার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, সেদিন থেকে পূর্ববর্তী সকল জাতির মাঝে লাশের অমর্যাদা এবং মুসলাহ বা অঙ্গচ্ছেদের যে জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল- মুসলমানদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেবল ইসলাম ধর্মই এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আর আব্দুল্লাহ বিন জু বায়ের (রা.)'র সেনাদের ভুলের কারণে এই বিপদ নেমে আসে। পক্ষান্তরে অনেক বড়ো একটি লাভও হয়েছে আর তা হলো, মুনাফিকদের কপটতা এবং ইহুদীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে আর নিষ্ঠাবান মুসলমান (মুনাফিক হতে সুস্পষ্টভাবে) পৃথক হয়ে গেছে।"(ফসলুল খিতাব, ১ম ভাগ, পৃ : ১২৬-১২৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভয়ংকর শত্রুদের একজন ছিল হিন্দ। উর্দুতে তাকে হিন্দা বলা হলেও আসলে তার নাম হলো হিন্দ। সে এত ভয়াবহ বিরোধী শত্রু ছিল যে, উহুদের যুদ্ধের সময় কবিতা পাঠ করে করে সৈন্যদেরকে উসকে দিচ্ছিল যে, অগ্রসর হও এবং ইসলামী সেনাদের ওপর আক্রমণ করো। মুসলমানরা যখন একটি ভয়াবহ পরিস্থি তির সম্মুখীন হয় তখন সে বলে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)'র কলিজা বের করে আমার কাছে আনতে পারবে আর একইভাবে তাঁর নাক ও কান কেটে নিয়ে আসবে আমি তাকে পুরস্কৃত করব। অতএব হযরত হামযা (রা.)'র লাশের সাথে এমন (অসম্মানজনক) আচরণই করা হয়। যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর চাচার (লাশের সাথে) এমন অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে তখন স্বভাবতই তিনি (সা.) কষ্ট পেয়েছেন; যে কারণে তিনি (সা.) বলেন, শত্রু যখন এ ধরনের পাশবিক আচরণের সূচনা করেই দিয়েছে তাই আমিও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করব। তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাদের এরূপ অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও তোমার এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না, বরং ক্ষমাসুন্দর আচরণ (দ্বারা কার্যসিদ্ধি) করা উচিত হবে।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৩-৩৫৪)

যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আপনারা জানেন, আমি ফিলিস্তিনীদের দোয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকি; দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকার পদক্ষেপ

নেওয়ার তৌফিক দান করুন। যদিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ কিছুটা সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে এবং বলছেও যে, অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, ইসরাঈলী সরকারের ভয়ে সবাই ভীত নতুবা পশ্চিমা বিশ্ব বৈশিষ্ট্যগতভাবেই মুসলিম বিরোধী। তাদের হৃদয়ে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ রয়েছে সেটির কারণে তারা চায়, মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চলমান থাকুক বা (অত্যাচার বন্ধে) যতটা প্রচেষ্টা করা দরকার ততটা না করা হোক। এরা দেখে না যে, নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যু লুম-নির্যাতন করা হচ্ছে। যাহোক, তাদের ওপর আমরা বেশি আস্থা রাখতেও পারি না; কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক, তাদেরকে বুঝাতে থাকা উচিত, পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকা আবশ্যক।

মুসলিম দেশগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা সাহস দিন, তারা যেন নিজেদের আওয়াজ উচ্চকিত করতে পারে আর প্র কৃতপক্ষে এক হয়ে এই যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং এর নিরসনের চেষ্টা করে।

নামাযের পর আমি দুজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা মোকাররম শেখ আহমদ হুসাইন আবু সারদানা সাহেবের। তিনি গাজায় বসবাস করতেন। মুহাম্মদ শরীফ ওদে সাহেব তাঁর বিষয়ে লিখেছেন যে, সম্প্র তি গাজায় ইসরায়েলী বোমা হামলায় আমাদের এই বুযুর্গ আহমদী শেখ আহমদ হুসাইন আবু সারদানা সাহেব শহীদ হয়েছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'***। মরহুম চলমান এ যু দ্ধে গাজার প্র থম শহীদ আহমদী। শেখ আহমদ আবু সারদানা সাহেবের বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৪ বছর। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী একজন আলেম ব্যক্তিত্ব। ১৯৭০ সালে তিনি নিজের কয়েকজন বন্ধুসহ হাইফাতে আসেন। সেই দিনটি যেহেতু ঈদের দিন ছিল, ঐশী পরিকল্পনার অধীনে মরহুম ঈদের নামায আদায়ের জন্য নিজ বন্ধুদের সাথে কাবাবীর গিয়ে উপনীত হন। মরহুম মোবাল্লেগ সিলসিলাহ মওলানা বশীরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ্ সাহেব ঈদের খুতবায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেনযার ফলে মরহুম শেখ আবু সারদানা সাহেবের আগ্র হ বেড়ে যায়। তিনি পাশে বসা আহমদী ফালাউদ্দীন ওদে সাহেবকে বলেন, মওলানা বশীরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ সাহেবের সাথে আমার বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিন। আলোচনাকালে তিনি মওলানা সাহেবকে বলেন, আমাকে আমার প্রয়াত পিতা উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি যদি নিজ জীবনে ইমাম মাহদীর আগমনের সুসংবাদ পাও তাহলে অবশ্যই বয়আত করবে'। অতএব সেদিনই মোকাররম শেখ আহমদ আবু সারদানা সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁকে বয়আত করতে দেখে তাঁর কোনো কোনোসাথিও বয়আত গ্রহণ করেন। মরহুম নিজ এলাকায় একজন সম্মানিত আলেম হিসেবে সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নেই তবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মাঝে কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন। বয়আতের পর মরহুম যখনই সম্ভব হয়েছেকাবাবীরেও আসা-যাওয়া করেছেন এবং কাবাবিরের আহমদীদের সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখতেন আর বেশ কয়েকবার তিনি একথা প্রকাশও করেছেন যে, তিনি সত্যিকার আহমদী।

পবিত্র কুরআনের সাথে অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। তিনি সচরাচর প্রতি এক সপ্তাহে একবার সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে শেষ করতেন। তিনি আমাকে রেকর্ড করে বাণী প্রে রণ করেছিলেন, সেখানেও এর উল্লেখ রয়েছে। ফিলিস্তিনের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হুসাইন সারদানা মরহুম আহমদ আবু সারদানা সাহেবের ভাই ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও উক্ত দু র্ঘ টনায় আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও সুস্থ করে দিন।

ডা. আযীয হাফীয সাহেব এখান থেকে হিউমিনিটি ফার্স্ট-এর কাজে সেখানে যাওয়াআসা করতেন। তার সাথে ডা. সাহেবের সাক্ষাতের সু যোগ হয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি আমার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। আমি বলি, আপনি বসু ন। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে নিজের লাঠি দ্বারা আমাকে সামান্য স্পর্শ করে বলেন, তুমি যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো, আমি কীভাবে বসে থাকতে পারি? খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ ছিল। এরপর তিনি আমার হাত ধরেন এবং বলেন, যেই পবিত্র ভূমির সাথে তোমার সম্পর্ক সেখানে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে। আর মসীহ্ মওউদ ও খিলাফতের প্র তি তঁ ার এত অগাধ ভালোবাসা ছিল যা দেখে আমিও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি। এরপর তিনি ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে ফোনে আমার বরাবর একটি বাণী প্রেরণ করেন।(ডা. সাহেবকে বলেন,) আমি একটি বাণী রেকর্ড করাতে চাই। সেই বাণীটি ভাইরালও হয়েছে। আমি সেই বাণীর একটি অংশ এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমার উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রেরণ করেন তাতে তিনি বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেইএবং মুহাম্মদ (সা.) তঁ ার বান্দা ও রসূল। আস্সালামু আলাইকুম, হে খলীফাতুল মসীহ আলখামেস। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণটা পাঠ করি এবং প্রত্যেক ফজরে আমি আপনার জন্য দোয়া করি। হে আমার খলীফা! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়াবহ আধ্যাত্মিক বিপদ এবং দুশ্চিন্তার মাঝে নিপতিত। (এরপর বলেন,) সত্য ছাড়া জগতের আর কী চাই? (এরপর বলেন,) আপনার প্রতিটি আদেশ আমি মান্য করি। (এরপর বলেন,) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা এখানে বেশ কষ্টসাধ্য, কিন্তু আমি এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি ১৯৪৮ এর যুদ্ধে ৪৮ বছর বয়সে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি তিনটি সীমান্তবর্তী যুদ্ধে কমান্ডার হিসেবে সেবাদান করেছি এবং সীনায় আমি গৃহহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমার পিতা একজন বিখ্যাত সূফি ছিলেন। আমার ভাই মু হাম্মদ এখানে গাজারপ্রধান বিচারপতি ছিলেন। আমার বংশে এমন সদস্যও আছে যারা আমাকে হয়রানি করে। তাদের হেদায়াত এবং সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। এই জেলায় আমার সাথে কেবল কতিপয় বন্ধু রয়েছে। কয়েকজনের নামও তিনি উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, তারা আমারসন্তানের মতো প্রিয়। তাদের মাঝে একজন হলেন তারেক আবু দাইয়্যাহ সাহেব। আমার নিজের কোনো সন্তান নেই। (এরপর আমার জন্য দোয়া করে বলেন,) আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আর আমি আপনাকে নিশ্চয়তাদিচ্ছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লার সাথে যখন সাক্ষাৎ করব, আমি আপনার হাতে একজন বয়আতকারী হিসেবে উত্থিত হব; আমার বয়আত গ্রহণ করুন। (অর্থ্যাৎ আমি আমার বয়আত নবায়ন করছি এবং আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি সত্যিকার অর্থে মন থেকে একজন আহমদী।

এরপর বলেন,) আহমদীয়াতের বিশ্বাস ছাড়া আমার আর অন্য কোনোবিশ্বাস নেই।" কতক বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, তিনি আহমদী নন; এমনি এমনিই তাঁকেআহমদী বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর রেকর্ডকৃত বাণী এখন সম্মুখে আছে। এখন হয়তো বিরোধীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সহধর্মিণীকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের পক্ষে তাঁর দোয়া কবুল করুন এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন আর সেসব লোককে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার সৌভাগ্য দিন।

দ্বিতীয় জানাযা কেনিয়া নিবাসী জনাব উসমান আহমদ গাকোরিয়া সাহেবের। সম্প্রতিতিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'***।

তাঁর জামা'তের সেবাদানের বিবরণ অনেক দীর্ঘ, অর্থাৎ বহু দশক জুড়ে রয়েছে। ১৯৩২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০-এর দশকে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন।একজন পুরানো বুযুর্গ আরব আহমদী মরহুম সালেম আফির সাহেবের মাধ্যমে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এরপর তিনি মোবাল্লেগ সিলসিলাহ মোকাররম মওলানা রওশন দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন এবং জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বয়আতের এই অঙ্গীকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেনিয়া স্বাধীন হওয়ার পর কাওয়ালেপান পলিটেকনিক স্কুলের প্রথম স্থানীয় প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। একইভাবে আরেকটি পলিটেকনিকেল কলেজেও প্রথম স্থানীয় প্রিন্সিপাল হওয়ার মর্যাদা তিনি লাভ করেন যে-বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময় উল্লেখ করতেন। শিক্ষা বিভাগে উচ্চতর কর্ম কর্তা হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জামা'তী বইপুস্তক সোয়াহিলী ভাষায় অনুবাদ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। নাইরোবি জামা'তের প্রথম স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হবারও সৌভাগ্য হয় তার। একইভাবে কেনিয়া জামা'তের প্র থম দিকের স্থানীয় মুসীদের মাঝে তিনি পরিগণিত হন। মরহুম অনেকগুলো চমৎকার গুণাবলির অধিকারী নীতিবান মানুষ ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসপর্যন্ত নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কখনো অলসতা প্রদর্শন করতেন না। কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগদের প্রতি তার হৃদয়ে বিশেষ সম্মান ছিল। যদি কোনোআহমদী কোনো কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগের বিষয়ে কোনো ধরনের ভুল কথা বা অভিযোগ আকারে কোনো কথা বলতো তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিতেন, বরং অসন্তুষ্টি এবং কঠোর বিরক্তি প্রদর্শন করতেন আর সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, দেখো! আজ তোমাকে ঈমানের রঙে রঙিন করানোর পিছনে তাদেরই অবদান রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার তোমার যে সৌভাগ্য তোমার লাভ হয়েছে তা তাদের কারণেই হয়েছে, অন্যথায় তুমি তো অজ্ঞতার মাঝে পড়ে ছিলে। এ কারণে তোমার প্রতি এই লোকদের অনেক অনুগ্রহ রয়েছে আর তোমার বংশধরদের প্রতিও অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্য এমন ধরনের কথা বলো না। যাহোক, এটি ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমাদের মুবাল্লেগদেরকেও আর যারা নতুন যাচ্ছেন তাদেরও উচিত, তারা যেন সেই উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যেন স্থানীয়দের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ হন।

একইভাবে মরহুমের মাঝে আতিথেয়তার গুণও অনেক বেশি ছিল। তার প্রায় সব সন্তানই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন আর কোনো না কোনোভাবে জামা'তের সেবার করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তার এক পুত্র আব্দুল আযীয গাকোরিয়া সাহেব বর্তমান কেনিয়ার মজলিস আনসারুল্লাহর সদর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কৃপা এবং ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

****

এটা তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, আপনাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য যুগ খলীফাকে চিঠি লেখার পর তিনি আপনাদের সমস্যাবলীর সমাধান করে দেন। এটি তো তাঁরই অনুগ্রহ। আর আমাদের কিভাবে দোয়া করা উচিত সে প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রতি তোমরা নিজেদের ঈমান পূর্ণ কর। নিজেদের ঈমানের অবস্থা কি তা দেখা উচিত।

সন্তানের জন্ম দেওয়া বিশেষ কোন কৃতিত্বের কাজ নয়। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহেই সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের জন্মের পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, কিছু দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং আমাদের উপর সন্তানদের কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সব অধিকার প্রদান করা, দায়িত্ব ও কতর্বাবলী পালন করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সঙ্গে আরব আহমদীদের অনলাইন সাক্ষাত

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কানাডায় বসবাসকারী আরব আহমদীদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন, যাঁদের অধিকাংশই নবাগত আহমদী।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে সাক্ষাতানুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা হুযুরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করে।

একজন আরব আহমদী প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে দোয়া করলে তা বেশি কার্যকর হতে পারে? প্রশ্নকর্তা একথাও জানান যে, যখনই তিনি দোয়ার জন্য হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার জন্য লেখেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর দোয়া তখন দ্রুত কবুল হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, আপনাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য যুগ খলীফাকে চিঠি লেখার পর তিনি আপনাদের সমস্যাবলীর সমাধান করে দেন। এটি তো তাঁরই অনুগ্রহ। আর আমাদের কিভাবে দোয়া করা উচিত সে প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রতি তোমরা নিজেদের ঈমান পূর্ণ কর। নিজেদের ঈমানের অবস্থা কি তা দেখা উচিত। আকুল হতে হবে। অনুনয় বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। চলতে ফিরতে বলে দিলাম, আল্লাহ্ মিঞা আমার এই কাজটি করে দিও বা কোন সমস্যা দেখা দিলে কান্নাকাটি করে সিজদা করে নিলাম আর সমস্যা দূর হতেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে গেলাম- এমনটি যেন না হয়। এই জন্য ঈমানকে দৃঢ় করুন, নিজের মধ্যে অনুনয় বিনয় তৈরী করুন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামযের আদেশ করেছেন। আর এই নামাযগুলি ছাড়া অতিরিক্ত করলে সেগুলি হবে নফল। সেগুলিতে তোমরা দোয়া কর, অনুনয় বিনয় কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। এখন নিজের ঈমানের অবস্থা দেখুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যে দোয়া শোনেন এবং দোয়া কবুল করেন আর যে ধর্মের উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্ম যে শেষ ধর্ম সে বিষয়ের প্রতি আপনার পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত ঈমান রয়েছে কি না। আর আল্লাহ্ তা'লা যদি দোয়া নাও শোনেন, কারো দোয়া শোনা বা না শোনা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছে। এ নিয়ে ঈমান দোদুল্যমান হবে না। এই পর্যায়ের ঈমান হতে হবে। এরপর খোদার দরবারে ব্যকুলতার যে চিত্র হওয়া উচিত সেটি যদি অর্জিত হয় আর যে নামায আপনারা পড়ে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেন যে আপনার কাজ হওয়ার পরেও আপনার ঈমানী অবস্থা এবং দোয়ার চিত্র পাল্টাবে না এবং এই অবস্থার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করবেন, তবে আল্লাহ তা'লা অধিকাংশ দোয়া শুনে থাকেন। তথাপি তিনি মানুষের একশ শতাংশ দোয়া কবুল করার জন্য বাধ্য নন। এটি তাঁর ইচ্ছে, তিনিই সেটা উত্তম জানেন। একজন মোমেনের এমনকি আম্বিয়াগণেরও কিছু কিছু দোয়া কবুল হয় আর কিছু দোয়া কবুল হয় না। কেননা এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক,কখন কথা শোনা হয় আর আবার কখনও শোনা হয় না। যত্ন সহকারে নামায পড়া দরকার। যদি পাঁচ ওয়াক্ত যত্নসহকারে নামায পড়ি আর আর সেই সঙ্গে নফলও পড়ি তবে তা সব থেকে ভাল হয়। আর সেই সঙ্গে এই অঙ্গীকারও করুন যে এটা অস্থায়ী হবে না। প্রয়োজন হলে একত্রিত হয়ে দোয়া করতে শুরু করলাম, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাজির হলে গেলাম, আর সমস্যা মিটে যেতেই খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে জাগতিকতায় মগ্ন হয়ে পড়লাম-এমনটি যেন না হয়। তাই দোয়ার জন্য এক অবিরাম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে আর সেই সঙ্গে অনুনয় বিনয়ও দরকার আর ঈমানের পরিপূর্ণতাও দরকার।

প্রশ্ন: স্কুলে যে সব অনৈসলামিক শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলোর কুপ্রভাব থেকে শিশুদের কিভাবে রক্ষা করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বেশ কয়েকবার এ সম্পর্কে বলেছি যে, এর জন্য মা-বাবা দুজনকেই ত্যাগস্বীকার করতে হবে। আপনি কি ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত? সন্তানের জন্ম দেওয়া বিশেষ কোন কৃতিত্বের কাজ নয়। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহেই সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের জন্মের পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, কিছু দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং আমাদের উপর সন্তানদের কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সব অধিকার প্রদান করা, দায়িত্ব ও কতর্বাবলী পালন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এর জন্য বাচ্চাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। শৈশব থেকেই শিশুরা যেন জানে যে, তাদের মাবাবা তাদের বন্ধু, তাদের সব কথা তারা তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। তারা জানবে যে তাদের বাবা কঠোর নন, চোখ রাঙানো, বকাঝকা ও মারধর করা তাঁর কাজ নয়। তিনি আমাদের বন্ধু। এমনটি হলে শিশু প্রতিটি কথা তার বাবাকে বলবে। বিশেষ করে শিশু যখন ১২, ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে পৌঁছয়, তখন তারা বাবাকে বেশি ভয় করতে শুরু করে আর এইভাবে দূরত্ব তৈরী হয়। সেই সময় পিতাদের উচিত সন্তানকে কাছে টেনে নিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। এই পরিবেশে যে কোন কথা যা তারা বাইরে থেকে শিখে আসবে সেগুলি আলোচনা করুন।

এর ভাল ও খারাপ উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করুন। একটা বাচ্চা এখানে কানাডার পরিবেশে থাকে আর সে আপনার কাছে এসে বলে সমকামিতার বিষয়ে শিক্ষক আজ পড়িয়েছেন। আপনি এ সম্পর্কে কি বলবেন? আর আপনি বললেন,'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, আসতাগফিরুল্লাহ্, তুমি দুষ্টদের মত কথা বলছ আর এই বলে তাকে দুই চড় কষিয়ে দিলেন- তরবিয়তের এই পদ্ধতি ঠিক নয়।এখানে তো প্রথম থেকেই সব কিছু শিখিয়ে দেওয়া শুরু করেছে। ইউরোপ এবং এখানকার মত নোংরা পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে তারা এখন সবে ৭-৮ বছরের, এ সম্পর্কে তোমরা এখন কিছু বোঝ না। এইভাবে তাদেরকে বোঝানো আমাদের কর্তব্য। দশ, এগারো বছরের হলে যে সব কথা তোমাদের বোঝানো যায় সেগুলি তোমদের বুঝিয়ে দিব এগুলি কি, ইসলাম এ বিষয়ে আমাদের কি শিক্ষা দান করেছে আর সমকামিতা কোন ধরণের পাপ, কিভাবে একটি জাতিকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এই পাপের কারণে।আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট এটি অপছন্দনীয়। নর ও নারীর মধ্যে যে সম্পর্ক কি এর কারণ কি? এটি বংশ টিকিয়ে রাখার জন্য, কামলালসা পূরণ করার জন্য নয়। এই বিষয়গুলি বাচ্চাদের বলতে হবে আর এরপর যদি তারা প্রশ্ন করে তবে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ধমক দেন, ভয় দেখান, তবে তারা বলবে মায়ের কাছে এর উত্তরই নেই, বাবার কাছেও নেই। তাই আমরা বাইরে গিয়ে যা কিছু করছি তা সঠিক। এরা তো মূর্খ ও অশিক্ষিত মানুষ। তাই নতুন পরিবেশের সঙ্গে আপনাদেরকেও পরিচিত হতে হবে। নিজেদেরকেও সব কিছু জানতে হবে। এখন পুরোনো চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন প্রজন্মকেও রক্ষা করতে এর জন্য আমাদেরকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যে, এর কি কি খারাপ দিক রয়েছে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছেন এই কারণে আর আমরা কিভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে রক্ষা করব। তাদেরকে বলুন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রথমেই কুআন করীমে বলে দিয়েছেন। আমরা আহমদী মুসলমান, তাই আমাদের এই সব মন্দ কর্ম এড়িয়ে চলা উচিত, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হই। আর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজনরা কি কি পুরস্কার লাভ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার আচরণ কিরূপ হয়, কিভাবে তাদের দোয়া কবুল হয়- এই ধরণের ঘটনাবলীও তাদেরকে শোনাবেন যাতে তাদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কেবল একটি কথা বলে থেমে গেলে হবে না বরং এর প্রতিদানে যে পুরস্কার লাভ হয়েছে সেগুলিও তাদেরকে বলতে হবে। নেতিবাচক দিকগুলিও তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে, আর এর পরিণামে যে সব ইতিবাচক দিক প্রকাশ পাবে এবং পেয়ে থাকে সেগুলিও তাদেরকে বলুন। এই ধরণের ঘটনাবলী ও কাহিনী তাদেরকে শোনান, বন্ধুত্ব তৈরী করুন এবং তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে এমন ধরণের কিছু কিছু অনুষ্ঠান দেখার অনুমতিও তাদেরকে দিন। ইন্টারনেট ও টিভি একেবারেই বন্ধ করে দিবেন না। তাদেরকে একটা

সীমা পর্যন্ত দেখার অনুমতি দিন, যা তাদের বৌদ্ধিক স্তরের জন্য উপযোগী, ধর্ম যেগুলি সম্মত এবং জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এইভাবে তরবীয়ত করলে ধীরে ধীরে অধিকাংশ শিশুকেই রক্ষা করা সম্ভব। ইনশাআল্লাহ্॥

প্রশ্ন: যাদের সঙ্গে আমাদের আকিদাগত পার্থক্য রয়েছে,তাদের সঙ্গে অকপটভাবে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশের উপায় কি?

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন,আপনার সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক রয়েছে। আপনার সকল আত্মীয়ই কি আহমদ? তিনি উত্তর দেন, না। হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন আত্মীয়রা আহমদী নয়, তবুও তো তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। প্রশ্ন হল, আমরা বাধ্য তাই, কারণ আল্লাহ্ তা'লা রক্তের সম্পকীয় আত্মীয়দের সঙ্গ সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কোথাও একথা বলেন নি যে, যে সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় তোমার ধর্মের তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ আর যারা তোমার ধর্মের নয় তাদের সঙ্গে রেখো না। পিতামাতার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, যদি তাঁরা তোমার বিরোধিতা করেন,তবে তাদের বিরোধিতা নিজের জায়গায়। তাদেরকে বলে দাও, যেখানে আল্লাহ্র ধর্মের প্রশ্ন আসে, আমি তোমাদের কথা মানব না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে 'উফ'পর্যন্ত করবে না। তাদের সেবা কর। আল্লাহ্ তা'লা শিক্ষা দিয়ে রেখেছেন- কোন কপটতা ছাড়া তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা কর। মানুষের মনে কেন কপটতা সৃষ্টি হবে? আমরা একদিকে দাবি করি, আমাদের সকলকে ভালবাসা উচিত, সকলের প্রতি সহানুভূতি থাকা উচিত, সমগ্র মানবতার জন্য সহানুভূতি হওয়া উচিত। আঁ হযরত (সা.) কে সমগ্র জগতের জন্য রহমত বলা হয়। তিনি কেবল মুসলমান জাতি বা আহমদীদের জন্য রহমত ছিলেন না। তিনি যেহেতু সমগ্র জগতের জন্য আর আল্লাহ্ তা'লা অযাচিত অসীম দাতা এবং বার বার কৃপাকারী, এখানে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী এবং আঁ হযরত (সা.)-এর যে মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দান করেছেন, তার বাহ্যিক প্রতিফলন প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই কপটতার কোন স্থান নেই। কপটতা তো অনেক জঘন্য বিষয়। কোন খারাপ হতে দেখলে, যেভাবে কুরআন করীম বলেছে, মাবাবাকেও বলে দাও যে, এ বিষয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি না, অবশ্য মা-বাবা হিসেবে তোমাদের সেবা করার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে নিশ্চয় আমি পালন করব। আপনি বন্ধুকে বলতে পারেন যে, বন্ধু হিসেবে আমি তোমার সেবা করব। এতে কপটতা নেই। এটা তো মানবতার সেবা, আর এটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য। তাই সব সময় মনে রাখবেন, একজন মোমেনের কর্তব্য হল মানবীয় মূল্যবোধকে সনাক্ত করা। আপনি যখন মানবীয় মূল্যবোধকে সনাক্ত করতে পারবেন তখন আপনার মাঝে কোন কপটতা থাকবে না। আপনি তখন সত্য অন্তঃকরণে মানুষের সেবা করবেন। কিন্তু যেখানে ধর্মের বিষয় আসবে, সেখানে অকপটভাবে কোন স্তাবকতা ছাড়াই তাদেরকে বলে দিবেন, এটা আমার ধর্মের বিষয়, এ ক্ষেত্রে আমি তোমার কথা মানতে পারব না। তাই কিভাবে করতে পারি - আপনার এই প্রশ্নটাই ভুল। মানবতার সেবাই তো আমাদের ধর্ম।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক অতীতে বৈশ্বিক স্তরে অনেক বেশী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ুগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। এর ফলে উন্নত এবং অনুন্নত উভয় শ্রেণীর দেশ প্রভাবিত হয়েছে। যেমন রাজনৈতিক দ্বন্দের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ- মধ্যপ্রাচ্য। অন্যরা বিভিন্ন জাতির প্রলোভনে পা দিয়ে এবং অনেকে কোরোনার মত মহামারির কারণে প্রাণ হারাচ্ছে। প্রশ্ন হল এই পরিস্থিতি কতদিন চলবে আর আমরা নিকৃষ্টতম যুগে বাস করছি না কি নিকৃষ্টতর যুগ আসতে চলেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমনই এক যুগ ছিল যা একশ ত্রিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল, যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করেন আর আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবং তাঁর মান্যকারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা সেই সব পাপাচার এবং সমস্যাবলী থেকে রক্ষা পাবে যারা সত্যিকার মোমেন হবে। শুধু বয়আত গ্রহণকারীরা নয়। এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)লিখেছেন, কেবল আমার বয়আত করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। আমার বয়আতের সঙ্গে শর্তাবলী রয়েছে সেগুলিও পালনীয়। তাই প্রথমত, সেই যুগ এখন চলছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যেগুলির মধ্য থেকে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি। যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পৃথিবী যাচ্ছে, আজ যে পরিস্থিতি তা পৃথিবীর নিজের কৃতকর্মের পরিণাম। আল্লাহ্ তা'লার একটি প্রকৃতির নিয়ম প্রবাহমান রয়েছে যা সতত ক্রীয়াশীল। এর পাশাপাশি শরিয়ত বিধানও চলমান রয়েছে। মানুষ যখন খোদা তা'লাকে ভুলে যাবে, ব্যবহারিক দিক থেকেও এবং জাগতিক দিক থেকেও মন্দ কাজে লিপ্ত হবে বা নিজে থেকেই নিজেদের সমস্যার সমাধান বের করতে শুরু করবে, যার অশুভ পরিণাম বের হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তখন সেখানে প্রকৃতির নিয়ম ক্রীয়াশীল হবে। শরিয়তের নিয়মও কাজ করবে আর কাজ করে চলেছে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ খোদাকে ভুলে যাচ্ছে আর খোদাকে ভুলে গেলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার কোন মানেই হয় না। জগতের কাছে তারা যাচনা করতে চায়, রাজনীতিকরা মনে করে সাধারণ মানুষই তাদের শক্তি, সে খোদা তা'লাকে শক্তি হিসেবে মনে করে না। কেননা, মানুষই তাকে ভোট দিবে। (এরপর পরের সংখ্যায়.....)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে৪৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।(৩) উর্দু/ ইংরেজি কমপোজিং এ পারদর্শী হতে হবে। টাইপিং এর গতি মিনিটে ৪৫ শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে।

(৫) নিয়োগ কমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ: (প্রতিটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

১ম ভাগ: (৩০ নম্বর) কুআন করীম নাজেরা (দেখাপড়া) এবং ১ম পারার অনুবাদ। * চালিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) অনুবাদ।

২য় ভাগ (২০ নম্বর) কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত* জামাত আহমদীয়ার আকিদাসমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ* দুররে সামীন থেকে নযম (শানে ইসলাম)।

৩য় ভাগ: (২০ নম্বর) উচ্চমাধিক স্তরের ইংরেজি।

৪র্থ ভাগ (২০ নম্বর) মাধ্যমিক স্তরের গণিত (অফিসের ইম্প্রেস্ট সম্পর্কি প্রশ্ন)

৫ম ভাগ (১০ নম্বর) সাধারণ জ্ঞান।

৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9682587713, 09682627592

ই-মেল: diwan@qadian.in

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে লিখেছেন যে, কোন কোন উদারপন্থি এবং নামধারী নারী অধিকার আন্দোলনের প্রবক্তা নারীদের ইসলামের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হল, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পুরুষদের জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামতের মধ্যে মদ, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য এবং রমণীদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি ঐসব জিনিস ব্যবহার করে তারা মন্দ মানুষ নামে আখ্যায়িত হয়। একইভাবে এসব প্রতিশ্রুতি শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলারা এই পৃথিবীতে যা-ই করুক না কেন তাদের জন্য এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার অনুরোধ করছি। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২ মার্চ, ২০২১ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর বলেন,আসল কথা হল, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার কারণে এই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়। জানা কথা যে, ইসলাম বিরোধীরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে না জানার কারণেই এমন আপত্তি করে, কিন্তু পরিতাপ ও কষ্টের বিষয় হল, অনেক মুসলমান নামধারী মানুষও; যেহেতু নামসর্বস্ব মুসলমান আর কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকে তারা আবশ্যক মনে করে না আর পার্থিব জগৎ তাদের হৃদয় ও মননে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে, এর চাকচিক্যের পেছনেই নিজের সারাজীবন বিনষ্ট করে ফেলে এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 'খোদার ইবাদত'কে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে আর পারলৌকিক জীবনের অত্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ নেয়ামতকেও এই পার্থিব জীবনের নোংরা ও অস্বচ্ছ দর্পনে দেখার চেষ্টা করে, এ কারণেই এ ধরনের আপত্তি তাদের হৃদয়ে দানাবাঁধে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নেয়ামতরাজিকে রূপকভাষায় যেখানে এই পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর নামে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে জান্নাতের সেসব নেয়ামতকে সব ধরনের বিলাসিতা ও কুপ্রভাব বা অনিষ্ট থেকে মুক্তও ঘোষণা করেছে। অতএব, পবিত্র কুরআন জান্নাতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের বিশুদ্ধ পানীয় বা মদকে বিভিন্ন নাম ও অবস্থার সাথে বর্ণনা করেছে যা জ্ঞান, প্রাণশক্তি ও ঐশী প্রেম সৃষ্টি করে, সুগন্ধিযুক্ত, সুবাসিত ও পবিত্র। আর যারা এগুলো পান করে তারা অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক নেশায় আনন্দিত হয়। অতএব, সূরা আস্ সাফ্ফাতে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍۢ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ۔لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

(সূরা আস্ সাফ্ফাত: ৪৬-৪৮) অর্থাৎ, (ঝরনার) বহমান পানিতে পূর্ণ পেয়ালা তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে, (যা) স্বচ্ছ-শুভ্র (এবং) পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে। তাতে (পানীয়তে) নেশা হবে না এবং এর দরুন তারা মাতালও হবে না, জ্ঞানবুদ্ধিও হারাবে না। এরপর সূরা ওয়াকেয়াতে বলেছেন,

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۔بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ۔لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ

অর্থাৎ, তাদের কাছে (সেবার জন্য) বহু কিশোর আনাগোনা করবে যাদেরকে স্থায়ী পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে, পানপাত্র ও সুরাহী এবং স্বচ্ছ পানি ভর্তি পেয়ালা নিয়ে। এর দরুন তারা শিরপীড়াকবলিত হবে না এবং মাতালও হবে না।

এরপর সূরা দাহরে বলেছেন,

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا۔ وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا۔ وَ سَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

(সূরা আদ্ দাহর: ৬, ১৮ ও ২২) অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যবান লোকেরা এমন এক পেয়ালা থেকে পান করবে যা হবে কর্পূর মিশ্রিত। আর সেখানে তাদেরকে এমন এক পানপাত্র থেকে পান করানো হবে যাতে আদার সংমিশ্রণ থাকবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদের পবিত্র পানীয় পান করাবেন। এরপর সূরা মুতাফফিফীনে বলেছেন,

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ۔ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ۔وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ۔عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

(সূরা আল্ মুতাফফিফীন: ২৬-২৯) অর্থাৎ, তাদেরকে মোহরাঙ্কিত খাঁটি সুরা হতে পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরীর। আর প্রতিযোগীদের এমনই বিষয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের, (অর্থাৎ) এমন এক ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জান্নাতের সুরা বা পানীয়ের গূঢ় অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "স্বচ্ছ পানীয়ের পেয়ালা যা সুমিষ্ট পানির মতো নির্মল (তা) জান্নাতীদের দেওয়া হবে। সেই পানীয় ঐসব ত্রুটি থেকে মুক্ত, অর্থাৎ (এতে) শিরঃপীড়া, অচেতনতা এবং মাতলামি দেখা দিবে না। বেহেশ্‌তে কোন অনর্থক ও অযথা কথা শোনা যাবে না এবং কোন পাপের কথাও শোনা যাবে না। বরং চতুর্দিকে শান্তি আর শান্তি, যা রহমত, ভালবাসা এবং আনন্দের নিদর্শন (তা) শোনা যাবে। ... এখন এসব আয়াতের আলোকে সুস্পষ্ট যে, সেই বেহেশতী পানীয় পার্থিব মদের সাথে সামান্যতম সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্যও রাখে না বরং তা স্বীয় সকল বৈশিষ্ট্যে সেসব মদ থেকে স্বতন্ত্র ও বিরোধী। আর পবিত্র কুরআনের কোথাও একথা বলা হয় নি যে, তা পার্থিব মদের ন্যায় আঙুর থেকে কিংবা চিটে গুড় এবং বাবলা গাছের ছিলকা দ্বারা অথবা এরূপ অন্য কোন পার্থিব বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা হবে। বরং বারবার ঐশী বাণীতে একথাই বর্ণিত হয়েছে যে, এই পানীয়ের আসল বীজ হল ভালবাসা, ঐশী ক্ষমা, যা ইহজগৎ থেকেই মু'মিন বান্দা সাথে নিয়ে যায়। আর বাকী থাকলো সেই আধ্যাত্মিক বিষয়টি কীভাবে পানীয় কিংবা মদ আকারে দৃষ্টিগোচর হবে? এটি খোদা তা'লার (গুপ্ত) রহস্যাবলির মধ্য হতে একটি রহস্য, তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে যার জট খোলে আর বিচক্ষণ লোকেরা অন্যান্য লক্ষণাবলির প্রভাব দ্বারা এর বাস্তবতা উপলব্ধি করে।"

(সুরমাহ্ চশমা আরীয়া, রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭)

অনুরূপভাবে জান্নাতে প্রাপ্ত জুটির পবিত্রতাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তারা অত্যন্ত পবিত্র ও নেক সঙ্গী হবে, যাদেরকে অতি মূল্যবান মণিমুক্তার মতো তাঁবুতে লুকিয়ে রাখা হবে, সেসব জান্নাতবাসীর পূর্বে কোন জিন্ন ও ইনসান তাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি বলা হয়েছে তাহল,

'ওয়া জাওয়াজনাহুম বিহুরিন এনীন'

(সূরা আত্ তূর: ২১) অর্থাৎ, আমরা জান্নাতবাসীদেরকে সেসব অপরূপ সুন্দর সঙ্গীদের সাথে বিয়ে দিবো।

কাজেই, জান্নাত বা স্বর্গ শুধুমাত্র আয়েশ ও বিলাসিতার স্থান নয় বরং এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আধ্যাত্মিক একটি মোকাম বা স্থান। যদিও জান্নাতের নেয়ামতরাজির নাম পার্থিব বিভিন্ন জিনিসের নামে রাখা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে, আধ্যাত্মিক নেয়ামত; কোন জাগতিক বা দৈহিক বস্তু নয়। এ বিষয়টি এমনই যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি কোন আলেমকে বলেন, আমার কাছে সম্পদ আছে আর তখন সেই আলেম নিজের গ্রন্থাগারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে যে, আমার কাছে তোমার চেয়েও বড় ভাণ্ডার রয়েছে। এই উত্তরের অর্থ সেসব বই-পুস্তকের মধ্যে টাকা ভরা আছে- এমনটি নয় বরং এর অর্থ হল, তুমি যে জিনিসকে ভাণ্ডার বলছ তার চেয়ে কল্যাণকর জিনিস আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তফসীরে কবীরে এই ধরনেরই একটি আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেন যে,

"প্রথমত এই বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, পরকালের নেয়ামতরাজির বিষয়টি উপলব্ধি করা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। কাজেই ইহলৌকিক জীবনের আলোকে পারলৌকিক জীবনের ধারণা করা সঠিক নয়। পবিত্র কুরআন বলে,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(সূরা আস্ সাজ্‌দা: ১৮) অর্থাৎ, কোন মানুষই এটি জানতে পারে না যে, পরকালে তার জন্য কী কী নেয়ামত বা পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এথেকে অনুধাবন করা যায় যে, পবিত্র কুরআনে জান্নাত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা রূপক ভাষায় (করা হয়েছে) আর এর থেকে সেই মর্মার্থ গ্রহণ করা সঠিক নয় যা ইহজগতে এই ধরনের

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

শব্দাবলি হতে গ্রহণ করা হয়। ... পবিত্র কুরআন যখন বলেছে যে, মু'মিনরা সেই জান্নাত লাভ করবে যাতে থাকবে ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষ, নদী-নালা, নষ্ট হওয়ার নয় এমন দুধ, বিশুদ্ধ পানি, মোম এবং নির্মল মধু আর এমন পানীয় বা সুরা যা মাতাল তো করবেই না বরং হৃদয়কে পবিত্র করবে। অতএব, এর মাধ্যমে তাদের আপত্তির উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যেসব জিনিসকে নেয়ামত মনে করো; সত্যিকার মু'মিনরা যেসব নেয়ামত লাভ করে তা তার চেয়ে তুচ্ছ। যেসব নদনদীকে তোমরা নেয়ামত মনে করো তার পানি তো পঁচে যায়, কিন্তু মু'মিনরা সেসব নদনদী লাভ করবে; তার পানি কখনও পঁচবে না। যেসব বাগানকে তোমরা নেয়ামত মনে করো তা আসল নেয়ামত নয়, আসল নেয়ামত তো সেটি যা কখনও ধ্বংস হবে না আর তা মু'মিনরা লাভ করবে। যে মদ বা সুরাকে তোমরা নেয়ামত মনে করো, মু'মিনের তার প্রয়োজন নেই। তা তো নোংরা এবং বুদ্ধি বা বিবেকের ওপর আবরণ সৃষ্টির বস্তু। মু'মিনদেরকে খোদা সেই মদ বা পানীয় প্রদান করবেন, যা বুদ্ধি ও বিবেককে তীক্ষ্ণ করবে এবং পবিত্রতা বর্ধনকারী হবে। যে মধু তোমরা পছন্দ করো তাতে বিলাসিতা রয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লা মু'মিনদেরকে সেই মধু দান করবেন যা সকল প্রকার বিলাসিতা হতে মুক্ত। আর যে সঙ্গীদের নিয়ে তোমরা গর্ব করো, তারা নেয়ামত নয়, কেননা তারা নোংরা। মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এমন সঙ্গী দান করবেন, যারা হবে পবিত্র। যেসব ফলফলাদি তোমরা পছন্দ করো, তা শেষ হয়ে যায়, মু'মিনরা সেই ফল লাভ করবে যা কখনও শেষ হবে না, এবং সব সময় এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পাওয়া যাবে। এ বিষয়টি এত সুস্পষ্ট যে, বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যে ব্যক্তিই এর প্রতি অভিনিবেশ করবে সে এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে এবং এর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্বেষী ও অজ্ঞ, তার কোন চিকিৎসা নেই।... (বক্তব্যের) সারমর্ম হল, পবিত্র কুরআনে যেসব বাগান, নদনদী, ফলফলাদি এবং যে দুধ, মধু ও মদ তথা পানীয়ের উল্লেখ রয়েছে তা ইহজগতের বাগান, নদনদী এবং ফলফলাদি হতে একেবারে ভিন্ন আর সেখানকার দুধ, মধু ও মদ তথা পানীয় ইহলৌকিক দুধ, মধু ও মদ তথা পানীয় হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর পবিত্র কুরআন স্বয়ং এসব বিষয়ের এমন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করে দিয়েছে যে, এরপর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা কেবলমাত্র বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। আর এসব প্রবাদের উল্লেখ যেহেতু পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলিতেও রয়েছে তাই (কুরআনের) এসব আয়াতে এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষের জন্য অনুধাবন করা কঠিন।"

(তফসীরে কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪১-২৪৬)

এছাড়া মানুষকে বুঝানোর এবং এর প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্যই মূলত পারলৌকিক এসব নেয়ামতের নাম এই পার্থিব (বস্তুর) নামে দেওয়া হয়েছে। কেননা, ধর্ম সব ধরনের মানুষের জন্য হয়ে থাকে। তাই এমনসব জিনিস যা অনুধাবন করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য তা তাদেরকে এমন ভাষায় বুঝানো অপরিহার্য যা সকল শ্রেণির মানুষ বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং সকল পর্যায়ের মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এই প্রজ্ঞাকে দৃষ্টিপটে রেখে পবিত্র কুরআন পারলৌকিক জীবনের নেয়ামতরাজির জন্য এমন বাক্য ব্যবহার করেছে যা সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তাদের জ্ঞান ও মর্যাদা অনুপাতে আশ্বস্ত হওয়ার কারণ হবে। এরপর কাফেররা যেহেতু মুসলমানদেরকে খোঁটা দিত যে, এরা নিজেরাও সব ধরনের (জাগতিক) নেয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং আমাদের কাছ থেকেও এসব নেয়ামত দূর করতে চায়। তাই আল্লাহ্ তা'লা পারলৌকিক জীবনের নেয়ামতরাজিকে তাদের মস্তিষ্কের কাছাকাছি আনার জন্য এসব ইহলৌকিক জিনিসের নাম দিয়ে বুঝিয়েছেন। অথবা যারা এগুলোকে নেয়ামত মনে করতেন তাদেরকে সেসব জিনিসের নাম উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন যে, মু'মিনরা এসবকিছু (পরকালে) লাভ করবে। নতুবা, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতে এমন নেয়ামত থাকবে যা না পূর্বে কোন চোখ দেখেছে, না এ সম্পর্কে কোন কান শুনেছে, আর না-ই কারও হৃদয়ে এ সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা জন্মেছে। তবে, সেসব পুণ্যবান ও পবিত্র মানুষ, যারা এই জগতে থেকেও এসব জাগতিক বিলাসিতা থেকে মুক্ত থেকে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেছে; তাদেরকে এই জগতেই সেসব নেয়ামতের স্বাদ উপভোগ করানো হবে। আর এমন লোকেরা যখন জান্নাতে এসব নেয়ামতকে স্বীয় পূর্ণ রূপ ও অবস্থায় দেখবে তখন অবলীলায় বলে উঠবে, هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (সূরা আল্ বাকারা: ২৬) অর্থাৎ, এটি তো সেই রিযক যা আমাদেরকে এর পূর্বেও দেওয়া হয়েছিল।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পারলৌকিক জীবনের এই গূঢ়রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "খোদা তা'লা বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি জানে না যে, তার জন্য কী কী নেয়ামত লুক্কায়িত আছে (সূরা আস্ সাজদা:১৮)। অতএব, খোদা তা'লা এসব নেয়ামতকে গুপ্ত আখ্যা দিয়েছেন, পার্থিব নেয়ামতরাজির মধ্যে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটি সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর নেয়ামতরাজি আমাদের নিকট গোপন নয়। দুধ, আনার, আঙুর প্রভৃতিকে আমরা চিনি এবং সর্বদা এসব জিনিস খাই। কাজেই, এথেকে জানা গেল, ঐ সমুদয় জিনিস অন্য কিছু। ঐগুলোর সঙ্গে এসব জিনিসের কেবল নামেই মিল। অতএব, যে ব্যক্তি বেহেশতকে পার্থিব জিনিসের সমাহার বলে মনে করেছে, সে পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও বুঝে নি।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের নেতা ও অভিভাবক মহানবী (সা.) বলেন, বেহেশত ও তার নেয়ামতরাজি হচ্ছে এমন সব জিনিস যা কখনও কোন চক্ষু দর্শন করে নি, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নি এবং কোন হৃদয় কখনও কল্পনাও করে নি। অথচ আমরা পার্থিব নেয়ামতরাজি চোখেও দেখি, কানেও শুনি এবং মনের মধ্যেও ঐগুলি উপলব্ধি হয়। অতএব, যেহেতু খোদা ও তাঁর রসূল এই সমুদয় জিনিসকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জিনিস বলে প্রকাশ করেন, আমরা তখন কুরআন হতে দূরে সরে যাই। যদি মনে করি যে, বেহেশতেও পার্থিব দুগ্ধই থাকবে যা গাভী ও মহিষ দোহনে পাওয়া যায় তবে প্রকারান্তরে এতে একথা স্বীকার করা হয় যে, সেখানে দুগ্ধ প্রদায়িনী পশুর পালসমূহ মজুদ থাকবে, আর গাছগাছালিতে মধু মক্ষিকারা বহু মৌচাক তৈরি করবে এবং ফেরেশতারা অনুসন্ধান করে সেই মধু সংগ্রহ করে নদ-নদীতে ঢেলে দিবে। ইত্যাকার ধারণার সঙ্গে সেই শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য আছে কি, যেখানে এসব আয়াত রয়েছে যে, পৃথিবীবাসী কখনও ঐসব জিনিস দেখে নি এবং ঐসব জিনিস আত্মাকে আলোকিত করে, খোদার মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং সেসব (হল) আধ্যাত্মিক খাদ্য, যদিও ঐসব খাদ্যের সামগ্রিক চিত্র বাস্তবের রঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে, এগুলোর মূল উৎপত্তিস্থল (হল) আত্মা ও সাধুতা।"

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন দশম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮)

হুযূর (আ.) পুনরায় বলেন, "ইসলামী বেহেশতের হকীকত বা মূল তত্ত্ব এটিই। তা ইহজগতের ঈমান ও সৎকর্মের এক প্রতিচ্ছায়া। তা নতুন কোন জিনিস নয় যা বাহির থেকে এসে মানুষের নিকট উপস্থিত হবে। বরং মানুষের বেহেশত মানুষের অভ্যন্তর থেকে বহির্গত হয়। প্রত্যেকের বেহেশত তার ঈমান এবং আমলে সালেহ্ (বা সময়োপযোগী সৎকর্ম)। এই জগতেই যার উপভোগ শুরু হয়ে যায় এবং গুপ্তভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয় এবং নহরসমূহও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পরজগতে এসব বাগান বাস্তবরূপে অনুভূত হবে। খোদার পবিত্র শিক্ষা আমাদেরকে এটিই অবগত করে যে, সত্য-পবিত্র-সুদৃঢ় এবং কামেল ঈমান, যা খোদা এবং তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলি ও তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা মনোরম ফলদার বৃক্ষরাজিপূর্ণ বেহেশত, এবং আমলে সালেহ্ সেই বেহেশতের নদ-নদী।"

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন দশম খণ্ড, পৃ. ৩৯০)

আপনার প্রশ্নের এই অংশের যতটুকু সম্পর্ক যে, পরকালে শুধুমাত্র পুরুষদেরকে নেয়ামতরাজির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, নারীদেরকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। ইসলামী শিক্ষামালা সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণেই এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। কেননা, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে যেখানে নেক ও পুণ্যবান পুরুষদেরকে সেসব পরকালীন নেয়ামতের উত্তরাধিকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখানে নেক ও পুণ্যবতী

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

নারীদেরকেও ঐসব নেয়ামতের যোগ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআন বলেছে,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا *(সূরা আন্ নিসা: ১২৫)*

অর্থাৎ, আর পুরুষদের বা নারীদের মধ্য হতে যে সৎকাজ করে আর যদি সে মু'মিন হয়, (তাহলে) এরাই তারা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুরের আঁটির খাঁজ পরিমাণও অবিচার করা হবে না। একইভাবে বলেছে,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ *(সূরা আল্ মু'মিন: ৪১)*

অর্থাৎ, যে-ই মন্দ কাজ করবে তাকে কেবল তদ্রূপ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর পুরুষ ও নারীর মাঝে যে-ই সৎকাজ করবে আর যদি সে মু'মিন হয় তাহলে, এরাই সেসব লোক যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের অপরিমেয় রিযিক দান করা হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

"পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠী পুরুষদের সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন আইনকানুন প্রস্তাব করেছিল কিন্তু তারা কোথাও নারীদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করে নি। মহানবী (সা.) হলেন সেই প্রথম মানব, যিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেভাবে নারীদের ওপর পুরুষদের অধিকার প্রদানের দায়িত্ব একইভাবে পুরুষদের ওপরও রয়েছে নারীদের অধিকার প্রদানের দায়িত্ব।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ, আর নারীদের ওপর পুরুষদের যেরূপ অধিকার রয়েছে সেরূপে নারীদেরও অনেক অধিকার রয়েছে যা পুরুষদের প্রদান করা উচিত। এরপর জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য তিনি উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী আখ্যা দিয়েছেন। তার আবেগ ও অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখেছেন। তার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেছেন। তার তরবিয়ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যেভাবে জান্নাতে পুরুষের জন্য উন্নতির অফুরন্ত স্তর রয়েছে ঠিক সেভাবেই নারীর জন্যও উন্নতির অফুরন্ত দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।"

(জুমুআর খুতবা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৭, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ সালের আল্ ফযলে প্রকাশিত, পৃ. ৫)

পুনরায় হুযূর (রা.) বলেছেন,

"পবিত্র কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে দেখো, সকল সমস্যা, আদেশ ও নেয়ামতরাজিতে নারী-পুরুষ উভয়ের উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একথা বলা হয় যে, পুণ্যবান পুরুষ তাহলে এর সাথেই বলা হয়েছে পুণ্যবতী নারীগণ। কোথাও যদি উল্লেখ করা হয় যে, ইবাদতকারী পুরুষ তাহলে এর সাথেই উল্লেখ করা হবে যে, ইবাদতকারী নারীগণ। এরপর যদি উল্লেখ করা হয় যে, পুরুষরা জান্নাতে যাবে তাহলে এর পাশাপাশি এই উল্লেখও থাকবে যে, নারীরাও জান্নাতে যাবে। পুরুষের জন্য যদি উন্নত মানের বিভিন্ন পুণ্য করার সুযোগ থাকে আর তাদেরকে জান্নাতে একটি উন্নত মোকামে বা স্থানে রাখা হয় তাহলে তার স্ত্রী, যার পুণ্যসমূহ সেই মোকামের মর্যাদা সম্মত না হলেও তাকে তার স্বামীর কারণে সেই মোকাম বা স্থানেই রাখা হবে। একইভাবে নারী যদি উন্নত পুণ্যের অধিকারী হয় আর সে কারণে তাকে জান্নাতে উন্নত স্থানে রাখা হয় তাহলে তার চেয়ে (তুলনামূলক) কম নেকী বা পুণ্য অর্জনকারী স্বামীকেও তার বদৌলতে সেই মোকাম বা স্থানে রাখা হবে।"

(৩১ জুলাই, ১৯৫০ সাথে প্রদত্ত বক্তৃতা, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত ১৪ নভেম্বর, ১৯৬২ সালের আল্ ফযল, পৃ. ৪)

ইসলামী শিক্ষার আলোকে নারীদের দায়দায়িত্ব এবং এই জগতে তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ এবং পরকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন নেয়ামতের বিষয় সম্পর্কে আমিও বিভিন্ন জলসায় নারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেছি। ২০১৯ সালের জার্মানির বার্ষিক জলসায়ও আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছিলাম। সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

কোতোনোর এক খৃষ্টান পাদ্রী আমাদের মসজিদে এসে প্রশ্ন করেন আর বলেন, খোদা তা'লা স্বয়ং আমার পথপ্রদর্শন করেছেন। কয়েকদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দুইজন বুজুর্গকে দেখেছি। তাদের মধ্যে একজন বললেন, যে ধর্মের তুমি অনুসারী সেটি সঠিক নয়। দ্বিতীয় বুজুর্গ আল্লাহু আকবার উচ্চকিত করছিলেন। তাঁকে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং আমার ছবি দেখানো হল তিনি বললেন, এই দুইজন বুজুর্গই আমার স্বপ্নে এসেছিলেন। এরপর তিনি স্বপরিবারে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর বাড়ি সংলগ্ন একটি ছোট চার্চ ছিল যেটিকে তিনি মসজিদের বদলে ফেলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এইভাবেই অমুসলিমদের হিদায়াত করেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করছেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের একাধিক ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী শোনানোর পর বলেন: আজ আপনারা যারা কাদিয়ানে এসেছেন জলসায় অংশগ্রহণ করতে আর যারা নিজেদের দেশে আছেন, আপনারা সকলে একথার সত্যতার প্রমাণ যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীকে এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা জন্য আপনারা সচেষ্ট হবেন। আপনাদের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করবেন। এখন দোয়া করে নিন।

হুযুর আনোয়ার দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন: দোয়ায় ফিলিস্তীনি ভাইদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদেরকে এই অত্যাচারের জাঁতাকল থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। সেই সব মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন যাদের দেশের সরকার তাদের প্রতি অত্যাচার করছে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র পথে বন্দীদের জন্য দোয়া করুন। নতুন বছর শুরু হচ্ছে। আজ রাতে তাহাজ্জুদে নতুন বছর কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং পৃথিবীর অন্যায় ও অত্যাচারের অবসানের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য অনুধাবন ও তাঁকে মান্য করার জন্য দোয়া করবেন।

হুযুর আনোয়ার জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন: এই মুহূর্তে কাদিয়ানের জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৯৩০জন। ৪২ টি দেশের অতিথি এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন।

হুযুর আনোয়ার পুনরায় দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন: বিশেষ ভাবে নতুন বছর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়ার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল মুসলমানদের উপর রহম করুন আর জামাত আহমদীয়াকে আরও উন্নতি দান করতে থাকুন। এখন দোয়া করুন।

৫:১৯টায় হুযুর আনোয়ার দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর প্রথমে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে উর্দু, আরবী এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সমবেত কণ্ঠে নযম পরিবেশিত হয়। এরপর টোগো এবং গিনি বাসাও থেকে যুবকরা নযম পরিবেশনের মাধ্যমে খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি নিজেদের ভক্তি ও অনুরাগ ব্যক্ত করেন।

মহিলাদের জলসা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাদের নিজেদের পৃথক জলসা আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মাননীয়া শামীম আখতার জ্ঞানী সাহেবা, সাবেক সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয়া তাহমীদা উমর সাহেবা। আর নাইয়ারা তানভীর ফারিয়া সাহেবা উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয়া সারাহ ওয়াকফি সাহেবা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন। 'জো খাক মিলে উসে মিলতা হ্যায় আশনা।' এরপর অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয়া আমাতুন নাসীর বুশরা সাহেবা, সেক্রেটারী তাহরীক জাদীদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল-'মোমেন নারীর বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বর্তমান যুগে তাদের অর্জন। এরপর একটি নাত পরিবেশিত হয়। 'জো আহমদ ভি হ্যায় আর মহম্মদ ভি হ্যায়।' মাননীয়া কুদসিয়া হাবীব সাহেবা নাতটি পরিবেশন করেন। এরপর সভার দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয়া আমাতুল ওয়াসী শুমাইলা সাহেবা, নায়েব সদর (প্রথম)লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীয়াগণের অতুলনীয় আত্মত্যাগ।' বক্তব্যের পর লজানা ইমাইল্লাহ্ কাদিয়ান- এর সদস্যারা সমবেত কণ্ঠে নযম পরিবেশন করেন। এরপর লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদর একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুবিলীর জন্য প্রবন্ধ রচনা বিশেষ স্থান অর্জনকারী সদস্যাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহাশয়ার দোয়ার মাধ্যমে মহিলাদের জলসার এই বিশেষ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আলহামদোলিল্লাহ।

******

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 1 Feb, 2024 Issue No.5

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দুই–একদিনের মধ্যে জলসা সালনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকেও অনেকগুলি দেশের এটি সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন–সেনেগাল, টোগো, গিনি কিনাকিরি প্রমুখ। এই দেশগুলিতে দুই দিক থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সম্মানের সঙ্গে খ্যাতি দান করব, মানুষের হৃদয়কে তোমার ভালবাসা ও ভক্তিকে আপ্লুত করব, তাদেরকে বলে দাও যে আমি ঈসার পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছি- এই সমস্ত দেশে জলসার আয়োজন, তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হওয়া, তাঁর নামে জয়ধ্বনি উচ্চকিত হওয়া- এগুলি সেই ঐশী প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণ যে তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এবং আঁ হযরত (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁরই দাসত্বে আবির্ভূত হয়েছেন। আজ কাদিয়ানের এই জনপদ যা একশ ২৫ বছর আগে এক অখ্যাত জনপদ ছিল, সেটিই আজ এক সুন্দর শহরে পরিণত হয়েছে।পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই খ্যাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নামের কারণে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির কারণে। আজ এই জনপদে পৃথিবীর বহু দেশের অধিবাসী জলসায় অংশগ্রহণ করতে একত্রিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে ৪২টি দেশের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত আছেন।

এমন এক জনপদ যেখানে পৌঁছনোর পথও ছিল দুর্গম, সেখান থেকে এক ব্যক্তি দাবি করছে, খোদা আমাকে বলেছেন, 'আমি তোমার পৃথিবীর প্রান্তে পৌন্তে সম্মানের সাথে খ্যাতি দান করব। আর সেই প্রতিশ্রুতি সমহিমায় পূর্ণ হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানদের আনন্দিত হওয়া উচিত যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যাঁর আগমণের সাথে ইসলামের পুনরুত্থানের নতুন যুগ শুরু হয়েছে। দুর্বলতা দূর করার যুগ এসেছে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এসেছে। কিন্তু তথা–কথিত উলেমরা সম্প্রদায়ের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধারণ মুসলমানদের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটিও খোদা তা'লার একটি প্রতিশ্রুতি যে, এমন এক সময় আসবে যখন তাদেরকে স্বীকার করতে হবে। এটা খোদার প্রতিশ্রুতি যে, তারা একদিন অবশ্যই স্বীকার করবে। এখন আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর আগমণ সম্পর্কে কিছু কথা বলব।

যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি এর সুন্দর ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, মসীহ মওউদ কে এই উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত করার প্রয়োজনই বা কি ছিল? এর উত্তর হল, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) তাঁর নবুয়ত্যের প্রথম ও শেষ যুগের নিরিখে হযরত মূসা (আ.) সদৃশ হবেন। সেই সাদৃশ্য প্রথম যুগে ছিল যা আঁ হযরত (সা.)–এর যুগ ছিল আর অপরটি শেষ যুগে। প্রথম সাদৃশ্য হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)কে খোদা তা'লা ফেরাউন ও তার সৈন্যসামন্ত এর উপর বিজয়ী করেছিলেন অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) অবশেষে সেই যুগের ফেরাউন আবু জাহল ও সৈন্যদের উপর বিজয় দান করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে ধ্বংস করে ইসলামকে আরব মহাদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। .... আর শেষ যুগের সাদৃশ্য হল খোদা তা'লা মূসা (আ.)–এর জাতিতে এমন এক নবী আবির্ভূত করেছেন যিনি জিহাদ বিরোধী ছিলেন, ধর্মীয় যুদ্ধের সঙ্গে তার তেমন সংস্রব ছিল না। বরং ক্ষমাপরায়ণতা ও তার শিক্ষা ছিল। আর এমন এক যুগে তাঁর আগমণ ঘটেছিল যখন কি না বনী ইসরাঈল জাতির ব্যবহারিক অবস্থা ও আচার আচরণে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। তাদের রাজত্ব পতনের মুখে ছিল, তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তিনি হযরত মূসা (আ.)পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে ইসরাঈলী নবুয়তের ধারার অবসান হয়। তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবুয়তের প্রান্তিক সত্তা। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)–এর শেষ যুগে ইবনে মরিয়ম রূপে এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে এই লেখককে আল্লাহ্ তা'লা আবির্ভূত করেছেন এবং আমার যুগে জিহাদ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। যেমনটি পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহর যুগে জিহাদ স্থগিত করা হবে। অনুরূপভাবে আমাকে ক্ষমাদানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর আমি সেই সময় আবির্ভূত হয়েছি যখন অভ্যন্তরীণভাবে অধিকাংশ মুসলমান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হয়ে কেবল প্রথা অবশিষ্ট ছিল।

হুযুর আনোয়ার হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) লেখনীর আলোকে মূসবী মসীহ এবং মহম্মদী মসীহর একাধিক সাদৃশ্য বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে শেষ যুগে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে প্রমাণ করেন যে, এটি প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের যুগ আর হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আ.) সেই মসীহ ও মাহদী যাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন করীম ও আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন।

আজ মানুষ কাদিয়ানে একত্রিত হয়েছেন যা একথারই প্রমাণ যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তবলীগের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। এটি তারই প্রমাণ।

মসীহ মওউদ (আ.)–এর আগমণের সময়ের নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ওয়া ইজাল ওহুশু হুশেরাত' অর্থাৎ এবং যখন পশুদেরকে মানুষদের সঙ্গে একত্রিত করা হবে। যার অর্থ, বর্বর জাতিসমূহ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে আ তাদের মধ্যে মানবতা ও শিষ্টাচার বিকশিত হবে। ভদ্র ও বর্বরদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। বরং বর্বরদের আধিপত্য থাকবে এমনকি ধন–ভাণ্ডার ও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া ইজাল বিহারু ফুজ্জেরাত' যে সময় নদীকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। অর্থাৎ ভূ–পৃষ্ঠে নদ–নদীর বিস্তার ঘটবে আর ব্যপকহারে কৃষিকাজ হবে। এবং যে সময় পাহাড় বিদীর্ণ করা হবে আর এর মাঝে রাস্তা ও রেল পথ নির্মিত হবে। অতঃপর বলেন, ঘোর অন্ধকার, অজ্ঞতা এবং পাপাচারে পৃথিবী ছেয়ে যাবে এবং নক্ষত্র পতন ঘটবে। অর্থাৎ ঐশী জ্ঞানে জ্ঞানী উলেমাদের মৃত্যু ঘটবে। স্মরণ থাকে, প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের বিষয়ে ইঞ্জিলেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তিনি সেই সময় আসবেন যখন চাঁদ ও সূর্য ম্লান হয়ে আসবে।

অতঃপর বলা হয়েছে, যখন নির্ধারিত সময়ে রসুল প্রেরণ করা হবে। এতে এ প্রকৃতপক্ষে মসীহ মওউদ এর আগমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং একথা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি যথাসময়ে আসবেন। বর্তমানে উলেমা সম্প্রদায় মসীহ মওউদ কে মান্য না করার দলিল হিসেবে বলে থাকেন, এর অর্থ এটি হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী সময়। কিন্তু যখন কিয়ামত আসন্ন তখন রসুলদের একত্রিত করার উদ্দেশ্য কি? আসল বিষয় হল এই যে, আঁ হযরত (সা.) এর দাসত্বে একজন রসুল আসবেন যিনি সমস্ত রসুলদের উম্মতকে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে আঁ হযরত (সা.)এর দাসত্বের অধীনে নিয়ে আসবেন। তথা–কথিত উলেমা সমাজ যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারত!

এরপর ঐশী সমর্থনের নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আব্দুল হক গাযনবী আমার সঙ্গে মোবাহেলা করে বলেছে, এর পরিণামে তার পুত্র সন্তান লাভ হবে। কিন্তু চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সন্তান এখনও জন্মে নি। চিরাগ দ্বীন জুমুনী নিজে থেকেই মোবার চ্যালেঞ্জ জানায় আর এর কিছু পর নিজের দুই পুত্র সহ মারা যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমর্থনের এই নিদর্শনাবলীর ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে যা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রকাশিত হয় এবং কিভাবে খোদা তা'লা মানুষকে স্বপ্ন জাতীয় পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে হিদায়াত লাভে সাহায্য করছেন তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

যেমন গিনি বাসাও, যেখানে আজ জলসা হচ্ছে, সেখানকার এক আহমদী সদস্য ইব্রাহিম সাহেব তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক অ–আহমদী মৌলবী জামাতের বিরুদ্ধে কুরুচিকর কথাবার্তা বলা শুরু করে। তিনি বলেন, আহমদীরা তো মুসলমান আর আপনি ইমাম হয়েও মিথ্যা বলছেন। একথা শুনে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি যেন শাস্তি পাই। এই কথা বলার পর সে সেখান থেকে চলে যায়। এখনও সে নিজের গ্রামেও পৌঁছয় নি। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, গ্রামের বাইরে তিনি পথ–দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন যাতে তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমার সঙ্গে বসে থাকা বন্ধুটি আমাকে জানায় যে, আজ আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন আমার সামনে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে আর আমি এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

ভারতের ইমফলে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তবলীগের জন্য জামাতের সদস্যরা যখন পৌঁছন আর সেখানে গৃহকর্তা যখন মসীহ মওউদ (আ.)–এর প্রচার পত্র হিসেবে বিভিন্ন ব্রাউজার বের করে দেখিয়ে বলল, ২০১৬ সালে আমি যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণ সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন থেকে আমি নিজেকে আহমদী হিসেবে ঘোষণা করে দিই। এতে মানুষ আমাকে মারার জন্য তেড়ে আসে আর আমাকে তোওবা করার জন্য আমার কাছে আসে। কিন্তু সেই দিন ভূমিকম্প হয় আর যারা আমাকে তওবা করানোর জন্য এসেছিল, তাদের এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয় তারা আর আসতে পারে নি। এই কারণে আমার জন্য আহমদীয়াত হল এক বিস্ময়ের নাম। আমি এর সত্যতার নিদর্শন দেখেছি। (এরপর ১১ পাতায়....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir